মডিউল-১

অধ্যায়-১

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস।

১.১ বাংলাদেশ ও বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস ঃ

বাঙ্গালি জাতির আদি পরিচয় ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করাই তার স্বভাব। এভাবে বাস করতে হলে চাই একে অন্যের সাথে সহযোগিতা। এ কারণেই মানুষের প্রয়োজন পড়ে সামজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। মানুষের তিনটি জিনিষ প্রথম প্রয়োজন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এরপরই মানুষ জীবনকে সুশৃংখল ও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিতে মনোযোগ দেয়। আইন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্ম প্রভৃতির উন্নয়নে। সমাজ জীবন বিকাশে মানুষের এ সমস্ত কর্মকান্ডের সম্মিলিত রুপই হচ্ছে তার সংস্কৃতি।

আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলায় আদি জনপদের মানুষেরা একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। বাংলায় সমাজ সংস্কৃতির এটাই সবচেয়ে প্রাচীন রুপ। পন্ডিতদের মতে, এদের ভাষার নাম ছিল "অষ্ট্রিক" আর জাতি হিসাবে এদের বলা হত "নিষাদ"। এরপর বাংলার আদি অধিবাসীদের সাথে মিশে যায় "আলপাইন" নামের একজাতি। আর্যরা আসার পূর্বে এরা মিলেমিশে বাংলায় সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

মোর্য শাসনের পূর্বে ব্যাপক অর্থে এতদঞ্চলে অধিবাসীদের কোন রাজনৈতিক সত্তা গড়ে ওঠেনি। এ সময়ের সমাজ বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত ছিল। একে বলা হত কৌম সমাজ, বিভিন্ন কৌম সমাজ কখন এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। তবে গ্রীক লেখকেরা এই অঞ্চলের গঙ্গারিডই নাম উল্লেখ করেছেন, তাতে সমগ্র এলাকার অধিবাসীদের এক জাতি হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে বলে মনে হয়। আর এই জাতি পরবর্তীতে বাঙ্গালি জাতির পূর্ব অস্তিত্ব বহন করে বলে পন্ডিতেরা অনুমান করেন।

প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রথম ধাপ হচ্ছে আর্যযুগের সংস্কৃতি। আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছে, ফলে ধর্ম ও সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন ধ্যান ধারণা ও আচরণ পদ্ধতি লালন করে আসছিল। তাই আর্য প্রভাবে বাংলার ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সেই সাথে এ যুগে পূর্বের সংস্কৃতির অনেক কিছুই পাশাপাশি চলতে থাকে। মোটের উপর প্রাচীন বাংলার সমাজ গড়ে তুলেছিল হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্তজ শ্রেণীর মানুষেরা।

এভাবে আর্য সংস্কৃতির পর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে বৌদ্ধ সংস্কৃতি। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ ধর্মে সকল মানুষের অধিকার স্বীকৃতি ছিল, তাই এ ধর্ম সকলে সহজেই গ্রহণ করে।

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন ঃ

বাংলার সামাজিক জীবন ছিল খুবই সাধারণ। তারা সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করতে বেশি পছন্দ করত। বর্তমান সময়ের বাংলার মানুষের খাওয়া দাওয়া সামাজিক আচার-আচরণের সাথে তেমন একটা অমিল ছিল না। প্রাচীন বাংলার মানুষ সেকালে উৎসব অনুষ্ঠানে নানা রকম খাবারের আয়োজন করতো। খাওয়ার শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতিছিল। পুরুষদের পোষক ছিল ধুতি ও মেয়েরা সাধারণ ভাবে শাড়ী পরত। তবে তাদের পরার কৌশল ভিন্ন হত।

প্রাচীন বাংলায় নানা রকম খেলাধুলা আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। খেলার মধ্যে পাশা ও দাবা ছিল জনপ্রিয়। তাছাড়াও সময়ের সাথে বিভিন্ন পুজা পার্বণ পালনেও তারা তৎপর ছিল। তাদের চলার বাহন ছিল

গরুর গাড়ি ও নৌকা। কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে প্রাচীন বাংলার আধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী ছিল এবং তারা অধিকাংশ গ্রামে বাস করত।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঃ

বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল অষ্ট্রিক। এ ভাষা আর্যদের আগমনের পর ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা। পরবর্তী কালে এ ভাষাকে সংস্কার করা হয়। এভাবে পন্ডিতগন বৈদিক ভাষাকে একটি সাহিত্যের ভাষায় রুপ দেয়। পুরানো ভাষাকে সংস্কার করা হয়েছিল বলে এ ভাষার নাম হয় সংস্কৃত ভাষা। অনেকে বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু আধুনিক পন্ডিতগন তা মেনে নেয়নি। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার নাম প্রাকৃত ভাষা। কালের ধারাবাহিকতায় সময়ের সাথে ভাষার ও পরিবর্তন হতে থাকে। বইপত্র লিখতে যেয়ে ভাষাকে আরো গুছিয়ে সুন্দর করলেন লেখকগণ। এবার ভাষাটির দুটি নাম হল একটি পালি আর অন্যটি অপভ্রংশ। এ যুগে পূর্ব ভারতের অনেক দেশে নতুন নতুন ভাষার সৃষ্টি হতে থাকে। এগুলোর সৃষ্টি হয় অপভ্রংশ ভাষা থেকে। এক সময় পরিবর্তনের সাথে এভাবেই সৃষ্টি হয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

বাংলাদেশে পাল ও সেন বংশের শাসন যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হয়েছে বেশি। তাই এ যুগে বাংলা ভাষার তেমন উন্নতি হয় নি। পরবর্তীতে মধ্যযুগে বাংলা ভাষার চর্চা বেড়ে যায়। ১২০০-১৩৫০ খ্রিষ্ট্রাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষার চর্চা চলতে থাকে। ১৩৫০-১৮০০ খ্রিষ্ট্রাব্দ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান কবিগন ব্যাপক ভাবে কাব্য-লিখতে থাকেন। মুসলিম যুগে মুসলিম সুলতানগন বাংলাভাষার উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করেন। ফলে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা শক্তিশালী ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর পরবর্তীতে এই বাংলা ভাষাভাষী মানুষই জাতিগত ভাবে বাঙ্গালি জাতি হিসাবে পরিচিতি পায়। আর এই বাঙ্গালি জাতি ছিল হিন্দু বৌদ্ধ ও অন্তজ শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে। ফলে একে অন্যের চিন্তা ভাবণা ও আচার-আচারণ মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এভাবে বাংলায় যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তাকেই বলা হয় বাঙ্গালি সংস্কৃতি।

১.২ ঃ মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীন সত্ত্বার উন্মেষ (১৯৫২) ঃ

যুগের পর যুগ ধরে বাঙ্গালিরা বিভিন্ন বিদেশী শোসক ও শোষক দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়ে আসছিল। তাই স্বশাসনের অভাবে তারা পূর্ণাঙ্গ জাতি সত্ত্বায় পরিণত হতে পারেনি। কিন্ত তাই বলে তারা কখনও বিদেশী শাসন মনে প্রাণে গ্রহন করতে পারেনি। তারা প্রত্যেকটি শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কখনও পিছুপা হয়নি। বিদেশী হুন, পাঠান, মোগল ও ব্রিটিশরা বাঙ্গলিদের শাসন করেছে। সর্বশেষ ব্রিট্রিশরা ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা প্রদান করে। ধর্মীয় অদর্শের ভিত্তিতে এই দুটি রাষ্ট্র বিশেষ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয় । পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও শুধু ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রটি গঠিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবার পরপরই দেখা দেয় মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ভাষার বিরোধ।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। তারা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত ছিল এবং পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে বাংলাকে নিয়ে গর্ববোধ করত । উপরন্ত পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬% লোক বাংলায় কথা বলত। কিন্ত পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ৬% লোকের ভাষা উর্দুক পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব গ্রহন করে। এরূপ প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মাত্র ১৭ দিন পরেই ১ সেপ্টম্বর ১৯৪৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিস্ট তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। এ কমিটির অপর দুই সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম। এই সংগঠনই সর্বপ্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উথাপন করে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাসেমের তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু " শীর্ষক

একটি পুস্তিকা বের হয়। ১৯৪৭সালের অক্টোবরে নুরুল হক ভূঁইয়াকে আহবায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে ২ মার্চ শামসুল হককে আহবায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রতিনিধি, পূর্ব পাকিস্থান মুসমি লীগ ও তমদ্দুন মজলিসের সমন্বয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পূর্ণগঠণ করা হয় । ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথশ অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব বাংলার মুখ্য মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করায় তা অগ্রাহ্য হয়। পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেণ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ও ২৪ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠনে ঘোষণা করেন যে, " উর্দুই হবে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোন ভাষা নহে।" কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্ররা জিন্নাহর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে। এরপর ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিয়াকত আলী খান গণপরিষদের মূলনীতি রিপোর্টে ঘোষণা করেন যে, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান নিহত হওয়ার পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন সকলেই আশা করেছিল য , খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টার ক্রটি করবেন না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় য, তিনি ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জন সভায় ঘোষণা করেন যে, " উর্দুই হবে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তার এ ঘোষণায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যপক ক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার হয়। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে সর্ব দলীয় কর্মী সমাবেশে সকল রাজনৈতিক দলের সদস্য সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে, ২১ ফ্রেব্রুয়ারী প্রদেশ ব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। ২১ ফ্রেব্রুয়ারী দিবসের কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারী হরতাল এবং ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারী সাফল্যের সাথে পতাকা দিবস পালিত হয়। কারাগারে আটক অবস্থায় ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বন্দী মুক্তির দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামীলীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এদিকে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার নূরুল আমিন সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি সকল প্রকার সভা-সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলা ভবনের সামনে সমাবেশ করে। অততঃপর রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই শ্লোগান দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের সামনে আসলে পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকা পুলিশ মিছিলের উর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে রফিক, সফিক, সালাম, বরকত, জব্বার ও নাম না জানা অনেকে শহীদ হন এবং অনেকে আহত হন। এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলা কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী সকল স্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, সরকার বাংলা ভাষার দাবির নিকট নতি স্বীকার করে এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্থানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার জনগনের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙ্গালির সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এ আন্দোলন বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে সংস্কৃতিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির পথ দেখায় । এ আন্দোলনের সূত্র ধরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন , ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুথান , ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বাঙ্গালির একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ডঃ আবুল ফজল হক , পৃঃ ৮২ হতে ৮৫ ।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, পৃঃ ১৭৩হতে ১৭৬।
বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, পৃঃ ১৮০ হতে ১৯০।
উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি, প্রফেসর মোঃ ইউনুস আলী দেওয়ান , পৃঃ ৮৪ হতে ৮৮।

১.৩ ঃ ছয় দফা আন্দোলন ও আগরতলঅ ষড়যন্ত্র মামলা(১৯৬৬,১৯৬৮)ঃ

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বাঙ্গালিদের উপর শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ ও নির্যাতন। প্রথমে আঘাত আসে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে চলে অর্থনৈতিক বৈষম্য। প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে কোন বাঙ্গালিকে নিয়োগ করা হতো না। সামরিক বহিনীতেও ছিল ব্যাপক বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্থান ছিল পশ্চিম পাকিস্থানী শিল্প পতিদের কাঁচামালের যোগানদাতা। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সৃষ্ট চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য বাঙ্গালিজনগণকে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। আইয়ুব আমলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুঃশাসনেও জনগণ বিক্ষুদ্ধ ছিল। ১৯৬৫ সালে পাক- ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থান সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়লে পূর্ব বাংলার জনগণের বিভ্রান্তি দূর হয় এবং তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজেদের। এরূপ একটি বৈষম্য ও নিরাপত্তাহীন শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতি হতে পরিত্রান পাওয়ার আশায় পূর্ব পাকিস্থানে জনগণের মধ্যে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই সময় আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধিকার ও সংহতির প্রশ্নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৬ সালের ৫ও ৬ ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আওয়মীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি সম্বলিথ এক কর্মসূচি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিই ৬ দফা কর্মসূচি বা আন্দোলন নামে খ্যাত । অবশ্য সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটি এ ৬ দফা দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং আওয়ামীলীগ সম্মেলন বর্জন করে।

ছয় দফা আন্দোলন/ কর্মসূচি নিম্নরূপঃ

১ম দফাঃ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্রে রূপ দিতে হবে। সরকার হবে সংসদীয়। সার্বজনীনও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সরাসরি নির্বাচন হবে।

২য় দফাঃ ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা। অবশিষ্ট বিষয়ের উপর অঙ্গরাজ্য গুলির পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩য় দফাঃ (ক) সমগ্র দেশের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় দেশের দু'অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। অথবা

(খ) দেশের দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, তবে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা ও মুলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। এ ব্যবস্থায় ফেডারেল ব্যাংকের পরিচালনায় দু'অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪র্থ দফাঃ সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে।

৫ম দফাঃ বৈদেশিক মুদ্রার উপর অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে অঙ্গরাজ্য গুলোর সরকার গুলো আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।

৬ষ্ঠ দফাঃ পূর্ব পাকিস্তান প্যারা মিলিশিয়া (আধা সামরিক) বাহিনী গঠন করতে পারবে।

ছয় দফার মূল কথা ছিল পূর্ব পাকিস্তান শুধু একটি প্রদেশ নয় বরং একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সঠিক বাস্তবায়ন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। সর্বোপরি ছয় দফা ছিল বাঙ্গালির মুক্তির সনদ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাঃ বাঙ্গালির মুক্তির সনদ ছয় দফাকে চিরতরে নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্থানী শাসকগোষ্ঠী যে চক্রান্ত করে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল তার ফলশ্রুতি। ১৯৬৮ সালের ১৯জুন হাইকোর্টের

বিচারপতি নিয়ে গঠিত কুর্মিটোলা সেনানিবাস বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচার শুরু হয়। প্রতিদিনের বিচারের কার্যবিবরণী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। বিচারের কার্যবিবরণী পড়ে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এই মামলাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। ফলে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুথানের প্রবল চাপের মুখে ২২ ফ্রেব্রুয়ারি আইয়ুব খান উক্ত মামলা প্রত্যঅহার করতে বাধ্য হন। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্যান্য আসামিরা বিনাশর্তে মুক্তি লাভ করেন।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ডঃ আবুল ফজল হক , পৃঃ ১০৩ হতে ১০৭ ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, পৃঃ ২১২ হতে ২২০।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, পৃঃ ২১২ হতে ২২৫।

উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি, প্রফেসর মোঃ ইউনুস আলী দেওয়ান , পৃঃ ১১৭ হতে ১২০।

১.৪ ঃ বঙ্গবন্ধু ও ৬৯ এর গণঅভ্যুথান (১৯৬৯)ঃ

বাঙ্গালিদের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি ৬ দফাকে চিরতরে নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যে চক্রান্ত করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল তার ফলশ্রুতি। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ মামলা দায়ের করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও ৩৪জনকে আসামী করে এ মামলা দায়ের করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয় আসামীরা ভারতের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছেন। ভারতের আগরতলা নামক স্থানে এ ষড়যন্ত্র করা হয়। এ কারনে মামলাটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

এ মামলার লক্ষ্য ছিল বাঙ্গালি স্বায়ত্ত্বশাসন বাদিদের ভীতি প্রদর্শন করা এবং তাঁদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে স্বাধিকার আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করা। কিন্তু বাস্তবে এর ফল হয় বিপরীত। শাসকগোষ্টীর এই চক্রান্ত ও দমন নীতির ফলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান বিভেদ, অবিশ্বাস ও ঘৃণার মনোভাব তীব্রতর হয় । শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বাংলার মানুষের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বাঙ্গালি জাতির নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ যখন চরম বিক্ষুব্ধ ঠিক তখন পশ্চিম পাকিস্তানের আইয়ুব বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে গণতন্ত্র পুণরুদ্ধাররের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রগণ বিক্ষোভ আরম্ভ করে। বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের ফলে কিছু সংখ্যক ছাত্র নিহত হয়। ফলে আন্দোলন আরও ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ পশ্চিম পাকিস্তানের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে স্বাগত জানায় এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অতিদ্রুত গতিতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে। আন্দোলন পরিচালনার জন্য তৎকালীন ডাকসু সহ- সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে এক ছাত্র সংগ্রম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ৫জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দা দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করে । আওয়ামীলীগের ৬ দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচি মিলে পূর্ব পাকিস্তানে এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এতে ছাত্র শিক্ষক , কৃষক-শ্রমিক সকল শ্রেণীর মানুষের দাবিও অন্তর্ভূক্ত হয়। সে জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে বাংলার আপামর জনসাধারন বিপুল ভাবে সাড়া দেয়। এদিকে ১৯৬৯ সালে ৮ জানুয়ারী ঢাকায় ৮টি বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি ঐক্য জোট গঠন করে। তারা ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিতব্য র্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা বাতিল করে প্রত্যক্ষ নির্বাচনসহ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্টার জন্য সংগ্রামের আহবান জানান। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাপ সংগ্রাম পরিষদে যোগ না দিলেও তিনি তার অগ্নিবষী বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে ছাত্র যুব সম্প্রদায়কে সরকারের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শে মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানের জন্য জোড় দাবি জানান। ফলে এ আন্দোলন গণ বিপ্লবে পরিণত হয়। আইয়ুব সরকার এ বিপ্লবকে দমন করার জন্য কোন পন্থাই বাদ রাখেননি। কিন্তু নির্যাতনের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে ছাত্রদের মনোভাব ততই দৃঢ়তর হয়। ছাত্র আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন।আগরতরা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। হরতাল, কার্ফু, মিছিল, বিক্ষেঅভ, গুলি ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে

পরিণত হয় । ফলে দেশে অরাজকতা ও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আইয়ুব খান ক্রমে ক্রমে গণশক্তির নিকট নতি স্বীকার করত আরম্ভ করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্ত কোন কিছুই বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে পারেনি। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রনেতাগণ অবিলম্বে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। আইয়ুব খান এ দাবিও মেনে নিতে বাধ্য হন এবং ১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত অন্যান্য আসামীকে এক ঐতিহাসিক সংবর্ধণা দেয়া হয়। এ সংবর্ধণায় শেখ মুজিবকে ছাত্র জনতা বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভুষিত করেন তিনি ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। ৬ দফা ভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামীলীগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহবান জানায়। এদিকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ডাকদেন। ফলে সাধারণ আইন শৃংখলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। পরিস্থিতিত ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খঅন তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয় খানের হা ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে গণঅভ্যুথঅনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ডঃ আবুল ফজল হক , পৃঃ ১০৭ হতে ১০৯ ।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, পৃঃ ২২৭ হতে ২৩৫ ।
বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, পৃঃ ২২৭ হতে ২৩৯।
উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি, প্রফেসর মোঃ ইউনুস আলী দেওয়ান , পৃঃ ১২০ হতে ১২৫।

১.৫ ঃ সত্তর এর সাধারণ নির্বাচন ঃ

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি আইয়ুব খানের সংবিধান বাতিল করেন এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি ঘোষণা করেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তার উদ্দেশ্য এবং অচিরেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সলে ৫ অক্টোবর সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি হতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর হতে বাধা নিষেধ প্রত্যাহর করা হয় এবং ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের ভিত্তি হিসেব আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন। ইতোমধ্যে ১মার্চ ১৯৭০ এক আদেশ বলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে পূর্বতন প্রদেশগুলেঅকে পুররুজ্জীবিত করেন। পূর্ব পাকিস্থানে ভয়াবহ বন্যার কারণে অক্টোবর নির্বাচন করা সম্ভব না হলে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ও ১৭ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ গুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে পূর্ব পাকিস্থানে ঘূর্নিঝড় বিধ্বস্ত কয়েকটি এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি ।

জাতীয় পরিষদের জন্য প্রদেশগুলো আসন বন্টন নিম্নরূপঃ

প্রদেশ	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	সর্বমোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯
পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫
সিন্ধু	২৭	১	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় অঞ্চল	২৫	১	২৬
বেলুচিস্তান	৪	১	৫
মোট	৩০০	১৩	৩১৩

আইনগত কাঠামোয় পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের জন্য এক ব্যক্তি এক ভোট এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে ৩১৩ জন সদস্য নির্ধানণ করা হয়। এর মধ্যে ৩০০টি সাধারন আসন ও ১৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ব্যবস্থা কর হয় । এছাড়াও প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদের ব্যবস্থা

করা হয় । বলা হয় যে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ গুলোতে সাধারণ আসনে সদস্য গণ প্রত্যক্ষ ভোট এবং মহিলা সদস্যগন নির্বাচিত সদস্যদের ভোট নির্বাচিত হবেন।

আওয়ামীলীগ সহ ২৫টি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহন করে। এই নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৬-দফা কর্মসূচিকে নির্বাচনী মেনিফেস্টো করে ৬ দফার প্রতি জনমত যাচাইয়ের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহন করেন। অন্যদিকে মুসলিম লীগ সহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো নির্বাচনকে পাকিস্থানের অখন্ডতার প্রশ্নে গণভোট বলে ঘোষণা দেন। এছাড়াও পিপিপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের চেষ্টা করে।

নির্বাচনী ফলাফলঃ

১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৫.০৯% এবং সমগ্র পাকিস্তানে তা ছিল ৫৭.৯৬%।

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফলঃ

দল	প্রাপ্ত সাধারণ আসন	প্রাপ্ত সংরক্ষিত মহিলা আসন	সর্বমোট
আওয়ামীলীগ	১৬০	৭	১৬৭
পিপলস পার্টি	৮৩	৫	৮৮
ন্যাপ(ওয়ালী)	৬	১	৭
মুসলিমলীগ (কাউন্সিল)	৭	-	৭
মুসলিম লীগ(কাইয়ুম)	৯	-	৯
মুসলিমলীগ (কনভেনশন)	২	-	২
পাকিস্থান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	-	১
জামায়াত-ই- ইসলাম	৪	-	৪
জমিয়তে উলামা-ই- ইসলাম	৭	-	৭
জমিয়তেউলামা- ই- পাকিস্তান	৭	-	৭
নির্দলীয় প্রার্থী	১৪	-	১৪
মোট	৩০০	১৩	৩১৩

পুর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ফলাফলঃ

দল	প্রাপ্ত সাধারন আসন	প্রাপ্ত সংরক্ষিত মহিলা আসন	সর্বমোট
আওয়ামীলীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পি ডি পি	২	-	২
ন্যাপ(ওয়ালী)	১	-	১
জামায়াত-ই-ইসলাম	১	-	১
নেজামী ইসলাম	১	-	১
নির্দলীয় প্রার্থী	৭	-	৭
মোট	৩০০	১০	৩১০

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৭ টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে গণ্য হয় অন্য দিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন লাভ করে ২য় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৮ টি আসন পায় আওয়ামীলীগ।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্থানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্থানের জাতীয় সংগতির প্রকট অভাব লক্ষ্য করা যায়। আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদের সর্বমোট ১৬৭ টি আসন ও পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৮টি আসন লাভ করায় পশ্চিমা কায়েমী শাসক মহল শংকিত হয়ে পড়ে এবং বাঙ্গালিদের হাতে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে না দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সেই ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙ্গলি জাতি মাতৃভুমি বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ডঃ আবুল ফজল হক , পৃঃ ১০৯ হতে ১১৫ ।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, পৃঃ ২৪৫ হতে ২৫৭।
বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, পৃঃ ২৩৯ হতে ২৪৬।
উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি, প্রফেসর মোঃ ইউনুস আলী দেওয়ান , পৃঃ ১২৫ হতে ১২৯।

১.৬ ঃ ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯৭১) ঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টনের এক বিরাট জনসভায় ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ভোর ৫ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত একটানা হরতাল ঘোষণা করেন। এ সময় কোট কাছারি, সরকারি অফিস, কলকারখানা, রেল স্টীমারসহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়। সভায় সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও জনগণের দাবি না মানা পর্যন্ত খাজনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পল্টনের ঐতিহাসিক জনসভায়, 'স্বাধীনতা বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পত্র প্রচার করা হয়। অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এ সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়।

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ঃ

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব নির্ধারিত ৭ মার্চে রেসকোর্সে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়াদী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক জনসভায় ভাষণ দেন। তাঁর এ ভাষণ-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে। রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রে জনগণকে স্বাধীনতা প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন --"ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" বঙ্গবন্ধু দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম" দেশকে মুক্ত করার সুদৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি আরো বলেন "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, তবু দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্‌"

৭ মার্চের ঐতিহাকি ভাষণ ছিল মুলতঃ বাঙ্গালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শাশ্বত প্রেরণার উৎস ও প্রতীক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী দেন, যা বাংলাদেশের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতে থাকে।

স্বাধীনতা পাগল জনগণের সর্বাত্বক অসহযোগিতার কারণে সকল সরকারি কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আক্রমন পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত আওয়ামীলীগ সদর দপ্তর হতে জারিকৃত আদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ১৪ মার্চ বেসামরিক প্রশাসন চালু করার জন্য ৩৫ টি বিধি জারি করেন। পূর্ববাংলা কার্যত তখন তাঁর নির্দেশেই চলে।

১.৭ মহান মুক্তিযুদ্ধ ঃ

স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের শুরুর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই ২৫ মার্চের মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং ওয়ারলেস যোগে চট্রগ্রামের ঘনিষ্ট সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণের মাধ্যমে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা দেশবাসীকে জানানোর জন্য চট্রগ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা এম,এ হান্নান ২৬ মার্চ দুপুরে চট্রগ্রাম বেতার থেকে তা প্রচার করেন। ইতোমধ্যে চট্রগ্রামে কিছু সংখ্যক বেতার কর্মী শিল্পী ও শিক্ষক কালুর ঘাটে একটি স্বাধীন বাংলা অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র চালু করেন। উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা প্রচার করেন।

সারা বাংলাদেশে শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ব্যাপক অভিযান। অগ্নিসংযোগ ও অবিরাম গোলাবর্ষণ করে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয় ঢাকা শহরকে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। অন্যান্য স্থানেও একই ভাবে হানাদার বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। ক্যান্টনমেন্টগুলোতে বাঙ্গালি অফিসার ও তাদের পরিবার বর্গকে কড়া নজরে রেখে অফিসারদের কাছ থেকে আগেই অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিশ্চিহ্ন করা :

ইয়াহিয়া সরকারের এমন বিশ্বাসঘাতকতায় সমগ্র বাংলাদেশ প্রতিশোধ স্পৃহায় ফেটে পড়ে এবং পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্বতঃস্ফুতভাবে বাঙ্গালি কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, নারী, শিক্ষক, শিল্পী বুদ্ধিজীবীসহ সকল পেশাজীবী মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। এভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এ কারণে সমগ্র রনাঙ্গণকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সার্বিক যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

নিম্নে ১১টি সেক্টটরের নেতৃত্ব প্রদানকারীর বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

১নং সেক্টর ঃ মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল থেকে জুন) ও মেজর রফিকুল ইসলাম (ডিসেম্ববর পর্যন্ত)

২নং সেক্টর ঃ মেজর খালেদ মোশারফ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর) ও মেজর এ টি এম হায়দার (ডিসেম্ববর পর্যন্ত)

৩নং সেক্টর ঃ মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর) ও মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান (ডিসেম্ববর পর্যন্ত)

৪নং সেক্টর ঃ মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত

৫নং সেক্টর ঃ মেজর মীর শওকত আলী

৬নং সেক্টর ঃ উইং কমান্ডার এম কে বাশার

৭নং সেক্টর ঃ মেজর কাজী নূরুজ্জামান

৮ নং সেক্টর ঃ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল থেকে আগষ্ট) ও মেজর এম এ মনজুর (ডিসেম্ববর পর্যন্ত)

৯নং সেক্টর ঃ মেজর এম এ জলিল (ডিসেম্ববর প্রথমার্ধ), মেজর জয়নাল আবেদীন (ডিসেম্ববরের অবশিষ্ট) ও মেজর এম এ মনজুর অতিরিক্ত দায়িত্ব

১১নং সেক্টর ঃ মেজর আবু তাহের (আগষ্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত) ও ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

উল্লেখ্য যে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম এ জি ওসমানী।

বাংলদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন ঃ

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে.(বর্তমান মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানার অন্তর্রগত বৈদ্যনাথ তলা) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারী এবং অস্থায়ী সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৭ এপ্রিল তারিখে আনুষ্ঠানিক ভাবে আওয়ামীলীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার" শপথ গ্রহণ করে। তখন থেকে মুজিবনগর বাংলাদেশ সরকারের রাজধানীতে পরিণত হয়। অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু তিনি পাকিস্তানি কারাগারে আটক থাকায় তার অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সরকারের অন্যান্য দফতর ছিল-

প্রধানমন্ত্রী ঃ তাজউদ্দিন আহমদ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঃ খন্দকার মোশতাক আহমেদ

অর্থমন্ত্রী ঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঃ এ,এইচ,এম, কামরুজ্জামান।

কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আওয়ামীলীগের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এ ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়। এই নতুন সরকারের আহ্বানে বাঙ্গালিরা উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে।

মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা ঃ

অস্থায়ী সরকার দায়িত্ব পাওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে মনোনিবেশ করে। এপ্রিল মাসেই মুক্তিবাহিনী, বি,এল,এফ (মুজিব বাহিনী) নৌ কমান্ডো গঠন ও নিয়মিত বাহিনী পুণর্গঠনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। এ সময় বিমান বাহিনী ও স্থল বাহিনীকেও পূণর্গঠিত করা হয়.। সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে মুক্তিবাহিনী এবং মুজিব বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমন পরিচালনা করে।

সমগ্র রনাঙ্গণকে ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করে সার্বিক যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ও অনিয়মতি বাহিনী সর্ব্বাত্বক আক্রমনের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে তোলে।নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও এলাকা বিশেষে নিজস্ব বাহিনী গঠন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। মুক্তিযুদ্ধ প্রতিহত করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সহযোগি হিসেবে রাজাকার, আলবদর ও আল সামস্ বাহিনী গঠন করে। এর পরও মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে অর্জিত বাঙ্গালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন এই স্বাধীনতাকে পাক সেনারা রুখতে পারেনি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীন যুগ থেকে এ জনপদে বাঙ্গালির একটি স্থায়ী আবাসভূমি গড়ে তোলার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। এর জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষদের ও অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তিতুমীর, হাজি শরীয়তুল্লাহ্, ক্ষুদিরাম, মাষ্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা প্রমুখ সংগ্রামী বীর বাঙ্গালি বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। সর্বশেষ-পাকিস্তানের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন ও শোষণের ফলে

জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি স্বশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুরুষ, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের কোটি কোটি মানুষ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালি জাতি শৌর্য-বীর্যের সর্বোচ্চ প্রমান রেখেছিল। স্বাধীনতা ও দেশের জন্য আকাতরে প্রাণ, ধনসম্পদ ও সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক নজির বিহীন স্বাক্ষর রেখেছিল বাঙ্গালিসহ বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠী। পাকিস্তানি সৈন্যদের সকল অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে আমাদের জনসাধারণ দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদেরকে পৃথিবীর বুকে একটি আত্মনির্ভরশীল স্বাধীনজাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

১.৮ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঃ

স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) টুঙ্গীপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের একজন সেরেস্তাদার। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ পাস এবং ১৯৪৭ সালে একই কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি প্রাদেশিক বেঙ্গল মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৪৩ সাল থেকে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ তাঁর ফরিদপুর জেলায় নির্বাচনী প্রচারনায় নিযুক্ত করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালে এর অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর দলীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সূচনা ঘটে। একজন রাজবন্দী হিসেবে তখন তিনি ফরিদপুর জেলা অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলনে। তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো বঙ্গবন্ধু পার্টির সংঘঠন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করতেন। দলকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিপরিষদ (১৯৫৬-৫৮) থেকে পদত্যাগ করেন এবং তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একজন সংগঠক হিসেবে মুজিব দলের উপর এতটাই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আওয়ামীলীগকে পুনরুজ্জীবিত করার একক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববাংলা আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে। তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান সভা-কাম-আইনসভার সদস্য ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিক। পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুরু থেকেই তাঁকে বাঙ্গালিদের স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে এক অকুতোভয় সেনানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম ভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উপদলীয় কোন্দল বা ভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামীলীগে ভাঙ্গন সৃষ্টি কিংবা নেতৃস্থানীয় কারো কারো দলত্যাগ সত্ত্বেও নিজস্ব সাংগঠনিক দক্ষতার গুনে তিনি দলের জন্য এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। তিনি আওয়ামীলীগকে মজবুত ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করে রাজনৈতিকভাবে একে একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন। ১৯৬৬ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। ৬-দফাকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল 'আমাদের (বাঙ্গালির) বাঁচার দাবি' হিসেবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের

স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ধরা হয়েছিল। ৬-দফা কর্মসূচি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের মর্মমূলে সুনির্দিষ্ট আঘাত হানতে পারায় তা অতি দ্রুত গোটা জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করে। ৬-দফা কর্মসূচির ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর রক্ষণশীল অংশের মধ্যে এক ধরনের ভীতি ছড়িয়ে পড়লেও, এদেশের তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে ছাত্র, যুবক এবং শ্রমিক জনগোষ্ঠী এটিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে জাগ্রত হতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অবস্থানে ভীত-সন্ত্রস্ত আইয়ুব সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে একটি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়। আইয়ুব শাসনামলের অধিকাংশ সময়ই (প্রথমে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এবং পরে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত) বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ ছিলেন। দ্বিতীয় দফায় অন্তরীণ থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা ও সম্মোহনী নেতৃত্বে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ১৯৬৯ সালের প্রথমভাগে এক প্রবল বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে এবং '৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব সরকার তাঁকে বিনা শর্তে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তাঁর কারামুক্তির পরের দিন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে বঙ্গবন্ধুর সম্মানে ছাত্র-জনতা এক বিশাল সংবর্ধনার আয়োজন করে এবং উক্ত সমাবেশে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' (বাংলার বা বাঙ্গালির বন্ধু) খেতাবে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে তারা এক অবিসংবাদী নেতৃত্বকে খুজেঁ পান যিনি পানিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামলের মধ্যে প্রায় ১২ বছর সময়কাল কারাযন্ত্রনা ভোগ করেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মুখপাত্রের স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর ঘোষিত ৬-দফা দাবির পক্ষে জনগণ নিরঙ্কুশ রায় দেয়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রমনা রেসকোর্স ময়দানে একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই মর্মে দৃঢ় শপথ বাক্য পাঠ করান যে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে কোন মতেই ৬-দফা দাবির বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া হবে না। ৬-দফা কর্মসূচির ব্যাপারে আপোষহীন ও অনড় অবস্থানের কারণে জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনের সুযোগদানের পরিবর্তে তারা জনগণের রায়কে পদদলিত করার দৃঢ় সংকল্প নেয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন একতরফা বাতিল করে দেন। এর মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের মৃত্যু ঘন্টা বেজে ওঠে। পুরো প্রদেশ বিক্ষোভে ফুসে ওঠে। অসহযোগ-আন্দোলন চলাকালে (২-২৫ মার্চ ১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং তিনিই পরিণত হন সরকারের কার্যত প্রধান।

এই সময়ে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার এক সুবিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসপঞ্জিতে এক যুগান্তকারী অধ্যায় হয়ে আছে। তাঁর এই ভাষণে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে হস্তান্তরে ব্যর্থতার জন্য সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন। ভাষণের শেষাংশে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলা। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে..... মনে রাখবা আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবো, তবু এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। ..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

ইতোমধ্যে ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। পরের দিন থেকে আলোচনা শুরু হয় এবং তা বিরামহীনভাবে ২৫ মার্চ সকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়ে অসহযোগ-আন্দোলন এবং জনগণের সর্বাত্মক স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের কর্মসূচি কঠোরভাবে অব্যাহত থাকে। ছাত্ররা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ২ মার্চ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার কথা ব্যক্ত করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় তাদের বর্বরোচিত হামলা চালায়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী করে রাখা হয়। তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং জনগণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার অভিযোগ বিচারের সম্মুখীন হতে হয়।

২৫ মার্চে গভীর রাত্রে বাঙ্গালি জাতির উপর নেমে আসে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর জঘন্যতম গণহত্যা। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পূর্বেই ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং ওয়ারলেস যোগে চট্রগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রেরণের মাধ্যমে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী ২৬ শে মার্চ আওয়ামীলীগ নেতা এম,এ হান্নান চট্রগ্রাম বেতার থেকে তা প্রচার করেন। শুরু হয় পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ যুদ্ধ।

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বরে বাঙ্গালি জাতির সোনালী দিনের আর্বিভাব ঘটে। ঐ দিন পাকবাহিনীর আত্বসর্ম্পণের মধ্যদিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং চুড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমহানী এবং ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে বাঙ্গালি জাতি লাভ করে একটি স্বাধীন ভূখন্ড ও একটি স্বাধীন পতাকা। পূর্ব পাকিস্তান "বাংলদেশ নাম ধারণ করে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্ব প্রকাশ করে এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় সোনার বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদারিত্ব থেকে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি লন্ডন হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বাধীনতোত্তর কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সরকারকে অত্যন্ত প্রতিকূল এবং বিধস্ত অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়। কোটি কোটি জনঅধ্যুষিত যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের অসংখ্য সমস্যা নিয়ে তাঁকে শূন্যহাতে দেশ পরিচালনার কাজ শুরু করতে হয়েছিল। তাঁর সরকারকে আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং তাদেরকে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি, বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন, এবং অসংখ্য অনাহারী ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন যোগানসহ অন্যান্য কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তিনি হাজার ও প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে যখন দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বহি:বিশ্বে দেশ ও জাতির সুনাম বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী দেশীয় ও বিদেশী শত্রুরা বুঝতে পেরেছে যে, বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কে জীবিত অবস্থায় কখনই বাঙ্গালী জাতির বাহু থেকে আলাদা করা যাবেনা। সে কারণে বিশ্বাস ঘাতক দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কারীরা একটি নীল নকশা তৈবী করে এদেশের সেনা বাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাসী উশৃঙ্খল সদস্যদের দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট রাতের আঁধারে এদেশের স্রষ্টা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কে সপরিবারে নির্মম ভাবে হত্যা করে সাড়ে সাত কোটি জনগনের আসায় এবং জাতির মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন করে

অধ্যায়- ২
জাতি গঠনে যুবদের ভূমিকা

২.১ যুব এর সংজ্ঞা,যুব কর্মের ধারনা ও যুব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

যুবঃ যুব শব্দটি মানুষের বাড়ন্ত বয়সের এমন একটি ধাপ যার সাথে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পর্কযুক্ত। এ কারনে সুনির্দিষ্ট ভাবে যুবকে সঙ্গায়িত করা সম্ভব নয়। জীব বিদ্যার পরিসরে মানুষ যখন শৈশব পেরিয়ে বয়ঃ সন্ধিতে উপনীত হয় তখনই শৈশবের সমাপ্তি হয় এবং যুব বয়স শুরু হয়। তবে সমাজ বিদ্যার ভাষায়-

মানুষ যখন শিশু কাল শেষ করে কাজে নিয়োজিত হয় এবং বিয়ে শাদীর মাধ্যমে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহন করতে সক্ষম হয় তখনাই যুব বা প্রাপ্ত বয়স বলে ধরে নেয়া হয়। এ সঙ্গাটি সাধারনত দেশের সংস্কৃতি, মানুষের আচার আচরন, খাদ্যাভাস ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বয়স বা সংখ্যা তত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে যুবদের সংঙ্গায়িত করা হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও যুবদেরকে সংখ্যাতত্বের ভিত্তিতে সংগায়িত করেছে। যেমন- জাতিসংঘ ১৪ থেকে ২৪ বছর , কমন ওয়েলথ ১৬-২৪ বছর বয়সের মানুষদের যুব হিসাবে গন্য করেছে, সংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশে যুব সজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছর তারাই যুব।

যুব কর্ম কি? ঃ যুব কর্ম সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা। যা যুবদেরকে সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোন জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি, কৌশল ও পদ্ধতির দ্বারা তাদের কল্যান সাধন এবং উপন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে।

যুব কর্ম বলতে আমরা বুঝি-

i. যুবদের মধ্যে লুকায়িত প্রতিভাকে জাগ্রত করা।
ii. যুবদের আবেগ অনুভূতিকে ইতিবাচক খাতে প্রবাহিত করা।
iii. যুবদের আশা আকাঙ্খাকে পূর্নতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।
iv. যুবদের সচেতনতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা।
v. আলাদা বৈশিষ্ট্য পূর্ন জনগোষ্ঠী হিসাবে সমাজে যুবদের অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করা।
vi. যুবদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন তথা প্রধান সমস্যা লাঘবে কর্মসূচী গ্রহন করা।
vii. যুবদের কল্যান ও স্বার্থে কর্মসূচী গ্রহন করা।

যুব কর্মের বিভিন্ন দিক এবং প্রকার ভেদ-

যুব কর্মের ধারনা যাতে বুঝা যায় যে যুব কর্ম বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে। বাংলাদেশে যুব কর্ম মূরত নিম্নরূপ-

- অর্থনৈতিক কার্যক্রম
- সামজিক কার্যক্রম
- স্বাস্থ্যগত কার্যক্রম
- পরিবেশগত কার্যক্রম
- বিনোদন মূলক কার্যক্রম
- ক্রীড়া বিষয়ক কার্যক্রম
- অবক্ষয়রোধে কার্যক্রম
- ধুমপান ও মাদকাশক্তি রোধে কার্যক্রম
- নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম

অর্থনৈতিক কার্যক্রমঃ

১. বেকারত্বই যেহেতু বিপুল যুব জন গোষ্ঠীর প্রধান সমস্যা সেহেতু তাদের বেকারত্ব লাঘবে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের চাহিদানুযায়ী অথবা কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাব্য ক্ষেত্র সমূহকে চিহ্নিত করে সে সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষন প্রদান এবং স্বকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত করনের ব্যবস্থাগ্রহন।

২. আত্ম কর্মসংস্থাননে সহায়তা করনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন সুবিধা প্রদান।

৩. কারিগরী সহায়তা প্রদান।

সামাজিক কার্যক্রমঃ যুবদেরকে যুব সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে স্বেচ্ছা শ্রমে সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করন। যেমন- রাস্তাঘাট মেরামত, প্রাকৃতিক দূর্যোগে দূর্গত মানুষকে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমঃ যুবদের স্বাস্থ্য অটুট রাখার লক্ষ্যে ব্যাক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রজনন স্বাস্থ্য,এইচ আই ভি/ এইডস এবং প্রজনন তন্ত্রের সংক্রামন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কাযক্রম গ্রহন।

বিনোদনমূলকঃ যুবদের চিত্ত বিনোদনের জন্য সংগীত প্রতিযোগীতা, বিতর্ক প্রতিযোগীতা, নাটক,পালাগান,জারীগান ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহন।

পরিবেশ সংরক্ষন মূলকঃ পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য যুব সংগঠনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন এবং পরিবেশ সংরক্ষনে সচেতনতা.বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গ্রহন।

ক্রীড়া কর্মকান্ডঃ যুবদের শরীর গঠন ও মননশীলতা তৈরীতে অবদান রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও টুনামেন্টের আয়োজন।

অবক্ষয় রোধ বিষয়ক কার্যক্রমঃ যুবদের বিভিন্ন অবক্ষয় রোধে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য ধারনে পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহন।

ধুমপান ও মাদকাশক্তিঃ ধুমপান ও মাদকাশক্তির কূফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গ্রহন। প্রশিক্ষন কেন্দ্র এবং যুব সংগঠন ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহন।

যুব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাঃ

তারুন্যের অদম্য শক্তির সুষ্ঠ বিকাশের জন্য সেচ্ছাসেবী সমাজিক যুব সংগঠনে যুবদের সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। যুবদের চিত্ত বিনোদন, সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ইতিবাচক সমাজ কল্যান মূলক কাজে অংশগ্রহন, নেত্রত্বের বিকাশ, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খিলা, টিম ওর্য়াক, সেবার আদর্শ যুব সংগঠনের সাধ্য সেই গড়ে উঠে। এক কথায় একটি ভাল যুব সংগঠন একটি যুবকের দহৈিক, আত্মিক, মানসিক ও আর্থ সামাজিক বিকাশে যথেষ্টে সহায়তা করে থাকে। বিদ্যালয়ের সীমিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে যুবক যুঁথিগত বিদ্যা লাভ করে। যুব সংগঠন গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের সুষম মানসিক বিকাশ ঘটে। জনকল্যান মূলক কাজে অংশ গ্রহন করে যুবদের দৃষ্টি ভঙ্গি উদার হয় ও মানসিক দিগন্তের প্রসার ঘটে।

২.২ সমাজে যুবদের অবস্থান এবং যুব নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

যুব সমাজঃ যুব সমাজ আমাদের দেশের মূল্যবান সম্পদ। জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের (১৮-৩৫) বছর বয়সী জনগোষ্ঠীকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়স সীমার জনসংখ্যা দেশের মোট জন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যা প্রায় সাড়ে ৪ কোটি। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুব সমাজে সক্রিয় অংশ গহনের উপর অনেকাংশেই নির্ভর শীল। কারন তাদের মেধা, সৃজনশীলতা,সাহস ও প্রতিভাকে কেন্দ্র করেই গড়ে একটি জাতির অর্থনৈতিক,সামজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের যুব সমাজ জাতির ভবিষ্যৎ কর্নধার,নীতি নির্ধারক ও সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী। জনসংখ্যা সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও উৎপাদনমুখী অংশ হচ্ছে যুব গোষ্ঠী। অসংগঠিত,কর্মপ্রত্যাশী এই যুব গোষ্ঠীকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদন মুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং অনেক এনজিও এ যৌথ ভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যকে যা মনে রেখেই সরকার "ন্যাশন্যাল সার্ভিস" নামক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

যুব নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাঃ নেতার কাজ হচ্ছে নেতৃত্ব দেয়া। যুব নেতৃত্ব হচ্ছে যুব গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যকে অবিরত দিক নির্দেশনা পদান, এগিয়ে চলার প্রেরনা দান এবং সমন্বয় সাধন। একজন আদর্শ যুবরাইসমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে পারে। তার দখ্যতাই দেশ মাতৃকার জন্য ছিনিয়ে আনে জয়মাল্য এবং জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। সান্ত সেতুং বলেছেন, "যুবকরাই হচ্ছে গোটা সমাজের সবচেয়ে সক্রিয় আর সবচেয়ে সজীব শক্তি।"

ডাঃ লুৎফর রহমান লিখেছেন-"জাতির যৌবনকে ব্যবহার করতে শেখ তুমি জাতির পরম কল্যান করতে পারবে। যুবকের প্রান বড় সুন্দর বড় মধুর যে ওকে ব্যবহার করতে শিখেছে, যে জগতের রাজ হতে পেরেছে।"

যেকোন দেশের যুব জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দখ্য তেৃত্ব প্রয়োজন। দেশের যুবদেরঃ

- ✓ লক্ষ্য অর্জনে নীতি নিবারন এবং তার বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে যুব নেতৃত্ব প্রয়োজন।
- ✓ যুবদের কর্মস্পৃহা,দাযিত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে যুব নেতৃত্বের গুরু অপরিসীম।
- ✓ সংগঠন ও কাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যুব নেতৃত্বের প্রয়োজন।
- ✓ কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চত করতে নেতার আদর্শ ও ধারনা অপরের নিকট প্রকাস করার জন্য যুব নেতৃত্ব প্রয়োজন।
- ✓ সংগঠনে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আস্থা অর্জনে সংগঠনে মানবিক সম্পর্ক স্থাপনে, জাতীয় ও আঞ্চলিক সমস্যা নিরসনে যুব নেত্রত্ব প্রয়োজন।

২.৩ঃ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা ঃ

প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা সে দেশের যুব সমাজ। কারণ যুবকরাই একদিন

রাষ্ট্রনায়ক হয়ে দেশ পরিচালনা করবে, সেনা নায়ক হয়ে দেশরক্ষা করবে, শিক্ষাব্রতী হয়ে দেশে জ্ঞান বিতরণ করবে, প্রকৌশলী হয়ে গঠনমূলক কাজ করবে, চিকিৎসক হয়ে রোগীর রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করবে, কবি ও সাহিত্যিক হয়ে নতুন আদর্শের প্রেরণা যোগাবে। এক কথায়, ভবিষ্যতে তারা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও নিয়ামক হবে। তাদের ওপরই নির্ভর করে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত সমৃদ্ধি ও উন্নতি। সুতরাং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যুব সমাজ প্রত্যেক দেশেই জাতীয় জীবনের মেরুদন্ড স্বরূপ। মেরুদন্ড যেমন শক্ত ও সোজা হয়ে দেহের উন্নতি সূচিত হয়, তেমনি যুব সমাজ যদি জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়, তা হলে জাতীয় জাগরণের সূচনা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের শক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও উদ্যমের প্রতীক যুব সমাজ। কাজেই যুবদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ওপরই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। যুবরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হলে, শারীরিক ও চরিত্র শক্তিকে বলীয়ান হলে

দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বেচ্ছায় সৈনিক জীবন বরণ করতে হবে। সৈনিকের মতই দারিদ্র্য, নিরৰতা ও অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এজন্য চাই ব্যাপক প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি গ্রহণের প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকাল। এই উদ্দেশ্যেই যুবদের অর্জন করতে হবে অটুট স্বাস্থ্য, অদম্য মনোবল ও দুর্জয় সাহস। এই জন্য ভালো গ্রন্থ পাঠ, আহারে সংযম, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও ব্যায়ামানুশীলন করে দেহমন সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলতে হবে। নীতির পরিপূর্ণ অনুশীলন করার মাধ্যমে চরিত্রকে উন্নত করতে হবে এবং কর্মকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে যুব সমাজ এই মহান শিক্ষা বলেই "দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্কর পারাবার " লংঘন করে অসাধ্য সাধন করছে। স্বাধীন বাংলাদেশের যুব সমাজকে এই বিষয়ে পাশ্চাত্য ছাত্রসমাজের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলে বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে বিলাসিতা বর্জন করে যথার্থ কর্মী ও জ্ঞানের সাধক হওয়ার জন্য যত্নবান হতে হবে। বহির্বিশ্বেও নিবদ্ধ করতে হবে। দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের খবর রাখতে হবে এবং সকল ক্ষেত্র থেকেই জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতে হবে। লব্ধ শিক্ষা যাতে জাতীয় জীবনে কার্যকরী হয় সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাধীন দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হতে হলে স্বাধীন চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে হবে এবং প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে হবে। এজন্য যুবদের প্রবল কর্মোন্মাদনা ও অনুসন্ধিৎসা প্রয়োজন।

যৌবনকালে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলায় সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। দেশকে ভালোবাসার, দেশের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করার মত শক্তি অর্জন করতে হলে কতকগুলো মানবীয় গুণ এই সময়েই অর্জন করতে হবে।

স্বার্থত্যাগ, স্বাবলম্বন, ধর্মনিষ্ঠা, মানবপ্রীতি, সেবাপরায়ণতা, ধৈর্যশীলতা, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি সদগুণ মানুষকে মহৎকর্মের প্রেরণা দিতে পারে। যুবদের সিদ্ধিলাভের জন্য মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়নিষ্ঠা ও পাঠানুরাগ একান্ত প্রয়োজন। এসব বিষয়ে অবহেলা ভবিষ্যতে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। জনসেবার শিক্ষা এ সময় থেকে পেতে থাকলে ভবিষ্যত জীবনে তা খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। জনগণের উন্নতিতেই রাষ্ট্রের উন্নতি। সেই জনসেবার মনোভাব যুবদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হলে, দেশের জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে যুবকেরা দ্বিধাবোধ করবে না।

সমাজের অবস্থা যদি যথেষ্ট উন্নত না হয় তাহলে যুব সমাজ সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। সমাজে যদি অর্থনৈতিক দূরবস্থা থাকে, যদি সু-শাসনের অভাব হয় এবং নানাদিকে বিশৃংখলা থাকে তাহলে দেশেরও দূর্গতির সীমা থাকে না, যুবদের ও সুষ্ঠু জীবন গঠন সম্ভব হয় না। সুতরাং সমাজের উন্নতি অবশ্য প্রয়োজন এবং সর্বাগ্রে এ উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ অবশ্য করণীয়।

যুবদের একটি সমাজ আছে। যারা একা নয়। এই সমবেত যুব শক্তি যদি সমাজউন্নয়নের দায়িত্ব কিছু পরিমাণে গ্রহণ করে তাহলে সমাজের কতকগুলো দিকে প্রভূত উন্নতি হতে পারে। সমাজের সেবায় সব ধরণের কাজ হয়তো তারা করতে পারবে না, কিন্তু কতকগুলো কাজ অবশ্যই তারা করতে পারে।

যুব সমাজের প্রধান কর্তব্য হল জাতীয় পূণর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করা। তারা নানাভাবেই এই কাজে সাহায্য করতে পারে। প্রথমতঃ তারাই দেশের লোকের মনে রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে চেতনা জাগাতে পারে এবং মানুষকে রাষ্ট্রানুগত্য শিক্ষা দিতে পারে। তারা জনসাধারণকে পল্লীর নানা রকম হিতকর কাজে সাহায্য করতে

পারে। দেশের বুকে যে দূর্নীতি আত্ম প্রকাশ করেছ, সেই দূর্নীতি দূরীকরণের কাজে যুবসমাজ বহুল পরিমাণে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যে নিরৰরতার অভিশাপে আমাদের জনসাধারণ নিজেদের কল্যাণবোধ থেকেও বঞ্চিত, যুবরা তৎপর হয়ে উঠলে দেশ থকে সেই নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর হতে পারে। এ কাজের জন্য যুবদের নিজেদের ভালভাবে বিদ্যার্জন করতে হবে এবং অবসর সময়ে নিরক্ষর মানূষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করতে হবে। এ জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করে জনসাধারণকে শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত করে তুলতে হবে। যুবকেরা নিজেরা একদিকে যেমন অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ নীতি, ধর্মনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে, অন্যদিকে বিবিধ বিজ্ঞান-যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে। এজন্য বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দরকার। তাদের শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। দেশের সেবা করতে হলে দেশের ধূলোকাদা পায়ে মাখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

যুবরা যুব সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সেবাদল প্রতিষ্ঠা করতে পারে, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে, নিরৰরতা দূর করতে পারে, রাস্তাঘাট তৈরী করতে পারে, পত্রিকা প্রকাশ করে নিজেদের আদর্শ ও প্রয়াসের কথা প্রকাশ করতে পারে, লোক-সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে পারে, কুসংস্কার দূর করতে পারে এবং দয়া, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ ইত্যাদির প্রতি যুব সমাজ মনোযোগী হতে পারে।

সমাজসেবা করতে হলে যুবদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একা একা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বর্তমান যুগে কোনো স্থায়ী ভাল কাজ করা যায় না। তাই যুবদের একটা বৃহৎ সংঘ গঠন করতেহবে। সে সংগঠিত যুব শক্তিকে নিয়ে সহজেই সমাজোন্নয়নমূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এ সংগঠন দেশের মানুষকে সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করবে।

যুবরা সেবাদল প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের মধ্যে যে কোনো বিপদে তারা দ্রুত এগিয়ে আসবে। বন্যা, মহামারী, অগ্নিকান্ড ইত্যাদিতে তারা সেবার কাজে এগিয়ে আসবে। কোনো দূর্ঘটনা ঘটলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। এভাবে জনসেবা করা যুবদের কর্তব্য।

দেশে জনস্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সে জন্য যুবরা নিজেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখবে ও স্বাস্থ্য গঠন করবে। সে সাথে অসুখ যাতে না হতে পারে তার জন্য দেশেল স্বাস্থ্যরৰমূলক নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

এ ছাড়া আরো বিভিন্ন উপায়ে তারা জাতীয় কল্যাণে সাহায্য করতে পারে। আমাদের দেশ অসংখ্য গ্রামেরই সমষ্টি। ঐ সমস্ত গ্রাম সংস্কারের অভাবে বনে-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, সেখানকার পুকুর বিল প্রভৃতি কচুরিপানাতে ভরা। ফলে গ্রামগুলি নানা ব্যাধির আবাসস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুব সম্প্রদায় গ্রামের স্বাস্থ্য-শ্রী ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। গ্রামবাসীর সাহায্য, গ্রামের পথঘাট তৈরী, বন-জঙ্গল ও জলাশয় পরিস্কার করে তারা গ্রামের উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রাম উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুবদেরকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

যুবকদের সংগঠনের মূখপত্র থাকা দরকার। তারা সেটির মাধ্যমে নিজেদের আদর্শের কথা প্রচার করতে পারবে। তাছাড়া তাদের চিন্তামূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতাও তাতে স্থান পাবে। দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোক-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সহায়তা করতে হবে। নৃত্য, সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, কবি গান, আবৃত্তি,

পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং মাঝে মাঝে ভাল বক্তৃতার মাধ্যমে যুবরা জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে পারে। তাতে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেরও ব্যাপক প্রসার হতে পারে।

এ ছাড়া যুবারা কিছু কারিগরী বিদ্যা বা হাতের কাজ শিখতে পারে। যাদের পড়াশোনায় আগ্রহ নেই তারা প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে।

কুসংস্কারের বিরম্নদ্ধে যুবসমাজ অভিযান চালাতে পারে। তবে সেজন্য দয়া, পরোপকার, স্বাবলম্বন ইত্যাদি নৈতিক সদগুণের অধিকারী হয়ে যুবকদের সাহসী ও অদম্য মনোবলের অধিকারী হতে হবে।

যুব সমাজ যেমন একদিকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেশের বৈষয়িক উন্নতিতে সাহয্য করতে পারে অন্যদিকে জাতীয় চরিত্র গঠনেও যথেষ্ট কাজ করতে পারে। একতা, শৃংখলা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা জাতীয় চরিতের মেরম্নদন্ড। যুব সমাজের উচিত একতার আদর্শ স্থাপন করা এবং দেশবাসীর যাতে সকল প্রকার ভেদবুদ্ধি দূর করে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সেজন্য প্রেরণা দেয়া। প্রাত্যহিক জীবনের আচরণে শৃংখলা না থাকলে জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। যুবরা নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা করে কাজ করে সবার সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। তাদের উচ্চ আদর্শ ও নীতিকে সামনে রেখে কঠোর পরিশ্রম সহকারে কাজ করা উচিত যাতে স্বীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। তারা যদি জনসাধারণের সামনে ত্যাগ ও কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তবে জনসাবারণও ঐভাবে ত্যাগ ও কর্মের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবে।

যুব সমাজ যখন কর্মৰেত্রে নিয়োজিত হয় তখন সেখানে নিজের কর্মদক্ষতা, নিয়ম নিষ্ঠা, সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত যুবকগণ যদি ঘুষ না নিয়ে এবং সময় নষ্ট না করে যথাযথ সময়ে দায়িত্ব পালন করে তবে তা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। যৌবনের যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে হবে যথা সময় নষ্ট করা অনুচিত হবে। যারা সরকারী দায়িত্বে আছেন তারা যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন তবে সরকারে ৰতি হবে না।

যারা ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছেন তারা যদি সততার সঙ্গে ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন করেন, তবে দেশের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হবে। ওজনে কম দেওয়া, ভেজার মেশানো ইত্যাদি অন্যায় থেকে যুব সমাজ নিজেকে বিরত রাখতে পারলে দেশের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে।

যুব সমাজ যদি বিদেশে চাকুরি নিয়ে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং দেশে পাঠিয়ে দেয় তবে তা দেমের অর্থনীতিকে বিরাট ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। বিদেশে সততা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলে যুব সমাজ দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে পারবে।

যুবসমাজ যদি সৎ ইচ্ছা শক্তি দ্বারা চালিত হয় তাহলেই যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারবে। তারা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের সমস্ত কর্তব্য পালনে ব্রতী হয় তা হলে অদূর ভবিষ্যতেই বাংলাদেশ একটি সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

২.৪ সমাজ উন্নয়নে যুব সংগঠনের সম্পৃক্ততা ঃ

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের জীবন এর শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন কাল। সাহস,শক্তি,বুদ্ধি,উদ্যোগ,উৎসাহ-উদ্দিপন ত্যাগ,এর মহত্তর প্রেরণা ও স্বেচ্ছাসেবা দান ইত্যাদি গুণ এর সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে যৌবনকালে। তাই যুগে যুগে কবি,সাহিত্যিকগণ যৌবন এর জয়গান গেয়ে আসছেন। বিপুল সম্ভাবনার উৎস যুবদের একক শক্তি ও সম্ভাবনাকে সুশৃংখলভাবে দলীয় পর্যায়ে সংগঠিত করে সুসংহত করা হলে যুব সম্প্রদায় এর শক্তি সা র্থে ব্যাপকতা এবং কার্যকারিতা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পায়। দলীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ এর মাধ্যমে বাস্তব জীবন সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এর সুযোগ ঘটে তাদের। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় তাদের মাঝে ইতিবাচক সামাজিক মনোভাব, গণতান্ত্রিক চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতা, নীতি শৃংখলাবোধ, সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা, নেতৃত্বসুলভ মানসিকতা ও মূল্যবোধ এর বিকাশ ঘটে। দলীয় কাজের মাধ্যমে তাদের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণ শক্তি,সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি এবং সাংস্কৃতিকবোধ বিকাশ লাভ করে। চলমান জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বোধশক্তি জন্মাবার প্রক্রিয়াও শুরু হয় সাংগঠনিক পর্যায় থেকেই। এ প্রক্রিয়াতেই তাদের মাঝে যৌক্তিকতাবোধ,তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা শক্তি বিকাশ লাভ করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বৃহত্তর জীবন এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন এর বাস্তব মহড়া (রির্হাসাল) ঘটে স ংগঠন এর মাধ্যমেই। বিশ্ব যুব সম্প্রদায় এর সাথে তাদের একাত্মতা ও সংহতি জোরদার হয় সাংগঠনিক প্রক্রিয়াতেই যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণের জন্যপ্রয়োজনীয় কৌশলগত আচরণ দৰতা অর্জনেরও সুযোগ ঘটে এপ্রক্রিয়া ই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই –

(ক) কৌশল নৈপুন্যের সাথে জনসংযোগ করার দৰতা
(খ) সামাজিক দক্ষতা
(গ) উদার মানসিকতা
(ঘ) নেতৃত্বের দক্ষতা
(ঙ) ব্যবস্থাপনা দক্ষতা
(চ) পারিবারিক/ দলীয়/ সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা দক্ষতা।
(ছ) সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ার দক্ষতা যেমনঃ-
  (১) মনঃসংযোগ দক্ষতা
  (২) স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধিকরণ দক্ষতা
  (৩) ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ
  (৪) আত্মোপলব্ধি ও
  (৫) কঠোর পরিশ্রম করার মানসিক প্রস্তুতি।

আত্মোপলব্ধি আত্মোন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত অচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার মহড়া ঘটে। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ইতিবাচক দলীয় মানসিকতা গ এ মাধ্যমে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যুবদের মাঝে কর্মচাঞ্চল্য ও প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার বিকাশ ঘটে যা আত্ম প্রতিষ্ঠা অর্জনে অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। তাই প্রগতিশীল যুব নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিৰিত যুব সংগঠন এর ভূ কা বিকল্পহীন।

বাংলাদেশ এর বর্তমান প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন কৌশল হিসেবে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সংগঠিত যুব সম্প্রদায় এর সম্পৃক্তির অনিবার্যতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন। এ লক্ষ্যেই প্রা রম্ভিক পর্যায়ে যুব মন্ত্রণালয়, পরবতর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ক্রমবর্দ্ধমান সরকারী অর্থানুকুল্যে যুব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিম্নে তালিকাভূক্ত কার্যাবলী ঃ-

(ক) দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিৰণ
(খ) একক এবং দলীয়ভাবে আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রকল্পগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ
(গ) প্রশিৰিত যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ত দানে ঋণদান কর্মসূচী

(ঘ) যুব ক্লাব/সংগঠনে যুব সমাজের সম্পৃক্তি

(ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে যুব ক্লু/সংগঠন এর সাংগঠনিক পর্যায়ে সম্পৃক্তি

(চ) প্রশিৰিত যুব সংগঠন এর মাধ্যমে (ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও (খ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বিস্তার লাভ করেছে

যুব সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে যুবদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়ন এর কর্মসূচী সফলভাবে বাস্ত বায়ন করাসম্ভব। যুবগণ স্বাভাবিকভাবেই বন্ধু-বান্ধব দ্বারা প্রভাবিত হয় সবচেয়ে বেশী। তাই স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষিত যুব সংগঠন এর মাধ্যমে বিশাল যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ করে তাদের মাঝে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হতে পারে। গণশিক্ষার আওতায় ঃ-

(১) অক্ষর জ্ঞান
(২) হিসাব জ্ঞান
(৩) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
(৪) খাদ্য ও পুষ্টি
(৫) স্বাস্থ্য পরিচর্যা
(৬) দক্ষতার সাথে কৃষি/কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন
(৭) উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত করণ
(৮) ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধিকরণ
(৯) পারিবারিক শৃঙ্খলাবোধ ও পরিবার কল্যাণবোধ সম্পর্কে সচেতায়ন
(১০) পরিবার পরিকল্পনা
(১১) ন্যায়, নীতি ও অদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রতকরণ
(১২) শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টিকরণ
(১৩) পরস্পরের প্রতি সহমর্মিত ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করণ
(১৪) দলীয় কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ
(১৫) দায়িত্বশীল নাগরিকত্ববোধ জাগ্রতকরণ
(১৬) স্বেচ্ছাসেবাদানমূলক মানসিকতা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান

এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছা সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার সহ আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড সৃষ্টি ও সম্প্রসারণে প্রশিক্ষিত যুব সংগঠন ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে পারে। দারিদ্র পীড়িত বাংলাদেশের মৌলিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন ঃ-

(ক) লাগসই প্রযুক্তি
(খ) সঠিক পরিকল্পনা
(গ) ন্যূনতম পুঁজি
(ঘ) কঠোর পরিশ্রম করার মানসিক প্রস্তুতি
(ঙ) তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সুসংগঠিত যুব সংগঠন
(চ) স্থানীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিশেস্নষণ পূর্বক মৌলিক সমস্যা চিহ্নিত করে সাংগঠনিক পর্যায়ে সমাধান এর

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

যুব সম্পদে বাংলাদেশ যথেষ্ট সম্পদশালী। দেশের গোটা জনসংখ্যার ১/৩ ভাগই যুব। এদের মোট সংখ্যা ১১৯ মিলিয়ন। এরাই গোটা জনসংখ্যার সবচেয়ে সক্রিয় ও সজীব অংশ। এদের মাঝে যারা কর্মসংস্থান/আত্মকর্ম সংস্থানে প্রয়েজনীয় দক্ষত বৃদ্ধির প্রশিৰণ প্রাপ্ত এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকারী, তাদের জন্য অর্থকরী ক্রিয়াকর্ম সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ এর সুযোগ সবচেয়ে বেশী। এদের সক্রিয় উদ্যোগে গঠিত ও পরিচালিত যুব সংগঠন দারিদ্র পীড়িত বাংলাদেশ এর অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চারে সৰম হবে। ইতিমধ্যেই কর্মসংস্থান/আত্মকর্ম সংস্থানে প্রশিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলাদের আর্থ-সামাজিক সাফল্য জাতীয়

পরিকল্পনাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সারাদেশব্যাপী সাংগঠনিক পর্যায়ে সমন্বিত কৃষি/কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এর কর্মসূচী প্রশিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলাগণ সরকারী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে সম্প্রসারণ করতে পারে। উদীয়মান অর্থকরী সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান এর ক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী নির্বিশেষে সকল ব্যাংকই উদার নীতি গ্রহণ করেছে। এ পর্যায়ে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে সাংগঠনিক পর্যায়ে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রশিক্ষিত যুব সংগঠনকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিসহ সম্প্রসারণ এর ব্যাপক সুযাগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলাগণকে বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিতে হবে।

দেশে বিরাজমান প্রকট বেকারত্ব ও দারিদ্র বিমোচন এর জন্য সরকারী, বেসরকারী নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠানই সহযোগী ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসছে। এতে প্রশিক্ষিত যুব সংগঠন এর পক্ষে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনার অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। নেতৃত্বের গুনাবলীত ভূষিত যুব সংগঠকগণ এর সামনে এখন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। দুঃস্থ বেকার যুবক ও যুব মহিলা ভাই-বোনদের জন্য তাদের করনীয় দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবে এটাই সংল্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা। এ প্রক্রিয়াতেই জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি সঞ্চার করে জাতির প্রত্যাশা তারা পূরণ করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকল এর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা তারা অবশ্যই লাভ করবে।

২.৫ যুবদের দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

উন্নত বিশ্বের দেশ গুলো যখন গ্রহ থেকে নক্ষত্রে নতুন বিষয় উদ্ভাবনের নেশায় মগ্ন তখন আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিজেদের অভাব মোচনের কঠিন ভেলা তীরে আনবার যুদ্ধে মাতোয়ারা। কবে নাগাদ আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো তার পূর্বাভাস পাওয়া সত্যিই কঠিন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা প্রকৃতি এবং পরিবেশ। আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশে পূর্বের তুলনায় ফলন অনেক কমে গেছে, আর আবাদযোগ্য যে জমিগুলো আছে তাও ক্রমবর্ধমান মানুষের বসতবাড়ী স্থাপনের হুমকীর সম্মুখীন। এ অবস্থায় একটি জাতি শুধু কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকরে প্রকৃত পৰে জাতীয় উন্নতি হলে কূল পাওয়ার ৰেত্রে পশ্চাচপদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাই এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার লৰ্যে উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগীতার চিন্তা না করে আমাদিগকে তাদের প্রযুক্তিগত কৌশলগুলোর ধনাত্মক দিকগুলোকে গ্রহণ করা সমীচীন বলে মনে হয়। অন্তত আমাদের অর্থনীতির চাকাকেস আরও সচল করার ৰেত্রে উক্ত বিষয়টি খুবই ফলপ্রসূ।

যে দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ বেকার হয়ে যাচ্ছে, ক্রমবর্ধমান ঋণের ভার গ্রাসকরে ফেলছে তাকে। যাদের মাতাপিছু আয় উন্নত দেশগুলোর নাগরিকদের মাতাপিছু আয়ের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল তারা এখনও যুদি তাদের কল্যাণের স্বার্থে চিন্তা না করে, তবে ব্যক্তির উন্নতি ও জাতির উন্নতি হবে কিভাবে ? বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মহীন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বাবলম্বী হতে। যারা পরিকল্পনাগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করেন তারা কোন না কোন ভাবে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। আর যারা করেননি তারা নিজেদেরকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তারপরও রাষ্ট্রীয় অভিভাবকের চেষ্টার ত্রুটি নেই। বিভিন্ন মাধ্যমে নাগরিকদের কল্যাণে পরিকল্পনা করে কাজ করে যাচ্ছেন। এ ধরণের একটি মাধ্যম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের আওতায় অন্যান্য কর্মসূচীর সাথে নতুনমাত্রায় একটি বাস্তবধর্মী প্রশিৰণ ব্যবস্থা রহিয়াছে, যা "কারিগরী প্রশিক্ষণ"।

আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের মূলতঃ কোন কারিগরী জ্ঞান বা দৰতা নেই। ফলে তারা দেশে বা বিদেশে চাকুরী সুযোগ পাইনা বা স্বকর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না।

আর এই বিষয়টি অনুধাবন করেই উক্ত কর্মসূচীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আমাদের দেশেল বেকার যুব সমাজকে আত্মকর্মসংস্থান এর ৰেত্রে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়াই হচ্ছে এই প্রশিৰণ কর্মসূচীর মূল লৰ্য।

মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর অনেক দেশে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তারই সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগী এই প্রশিৰণ কর্মসূচীর আওতায় রাখা হয়েছেঃ-

০১. বৈদ্যুতিক সরঞ্জারে পরিচিতি এবং বাড়ী ঘরে বৈদ্যুতিক তার স্থাপনা সংক্রান্ত "ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং " ট্রেড। ০২. বিভিন্ন ধরণের রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন মেরামত সংক্রান্ত "রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং "ট্রেড। ০৩. গৃহস্থালীনসহ বিভিন্ন ৰেত্রে স্বাভাবিকভাবে দৃশ্যমান মিডিয়া মেরামত সংক্রান্ত "রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি মেরামত কোর্স এবং ০৪. বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কম্পিউটারের বহুমূখী ব্যবহারের মধ্য থেকে প্রচলিত ১ (এক)টি অপারেটিং সিষ্টেম এবং আরও ৩(তিন) টি প্যাকেজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটিং হিসাবে উপযোগী করে তোলার সংক্রান্ত "কম্পিউটার বেসিক কোর্স " তাছাড়াও কম্পিউটারে বিভিন্ন ডিজাইন তৈরীর জন্য কম্পিউটার গ্রাফিক্স জিজাইন কোর্স। এছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে আরো বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সমূহ হলো পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা এন্ড কম্পিউটার এপ্লিকেশন কোর্স, সুয়েটার নিটিং ও লিংকিং কোর্স ইত্যাদি। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বেকার যুবকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। ইতিমধ্যেই এর সুফল লক্ষ্য করা যাচেছ। প্রশিক্ষিত যুবরা দেশে এবং বিদেশে চাকুরীর সুযোগ তৈরী করতে পারছে। যারা চাকুরীর চেয়ে ব্যবসাকে বেশী পছন্দ করে তারা কয়েকজন মিলে একত্রে ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে যে বিষয়গুলোর খুবই প্রয়োজন তা হল একনিষ্ঠা, প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা।

২.৬ যুব দক্ষতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ

আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের মূলতঃ কোন কারিগরী জ্ঞান বা দক্ষতা নেই। ফলে তারা দেশে বা বিদেশে চাকুরীর সুযোগ পাইনা বা স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা অপরিহার্য যেমনঃ- ০১. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে পরিচিতি এবং বাড়ী ঘরে বৈদ্যুতিক তার স্থাপনা সংক্রান্ত "ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং " ট্রেড। ০২. বিভিন্ন ধরণের রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন মেরামত সংক্রান্ত "রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং "ট্রেড। ০৩. গৃহস্থালীনসহ বিভিন্ন ৰেত্রে স্বাভাবিকভাবে দৃশ্যমান মিডিয়া মেরামত সংক্রান্ত "রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি মেরামত কোর্স এবং ০৪. বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কম্পিউটারের বহুমূখী ব্যবহারের মধ্য থেকে প্রচলিত ১ (এক) টি অপারেটিং সিষ্টেম এবং আরও ৩(তিন) টি প্যাকেজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটিং হিসাবে উপযোগী করে তোলার সংক্রান্ত "কম্পিউটার বেসিক কোর্স " তাছাড়াও কম্পিউটারে বিভিন্ন ডিজাইন তৈরীর জন্য কম্পিউটার গ্রাফিক্স জিজাইন কোর্স ও ইন্টারনেট ব্যবহার ইত্যাদি। এছাড়াও যুব উন্নয়ন

অধিদপ্তরের মাধ্যমে আরো বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সমূহ হলো গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন কোর্স, সুয়েটার নিটিং ও লিংকিং কোর্স ইত্যাদি। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বেকার যুবকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। ইতিমধ্যেই এর সুফল লক্ষ্য করা যাচেছ। প্রশিক্ষিত যুবরা দেশে এবং বিদেশে চাকুরীর সুযোগ তৈরী করতে পারছে। যারা চাকুরীর চেয়ে ব্যবসাকে বেশী পছন্দ করে তারা কয়েকজন মিলে একত্রে ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারে। একটি দেশের যুবসমাজ কারিগরী বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ে যত বেশী দক্ষতা অর্জন করবে ততই সেদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। উপরোক্ত প্রশিক্ষণসমূহ গ্রহণ করে একজন বেকার যুবক বা যুবমহিলা দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে অথবা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গড়ে তুলতে পারে ফলে নিজেদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

অধ্যায়-৩

স্বেচ্ছাশ্রম, উন্নয়ন, সম্পদ , স্বচ্চতা এবং জবাবদিহিতা

৩.১ শ্রমের সংজ্ঞা, শ্রমের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন ধরনের শ্রম ঃ

শ্রমের সংজ্ঞাঃ 'শ্রম' বলতে সাধারনত শারীরিক পরিশ্রমকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমের আওতা ব্যাপক। এখানে শারীরিক ও মানসিক অর্থাৎ উৎপাদন বা আয় অর্জনের কাজে নিয়োজিত সব ধরনের পরিশ্রমকে 'শ্রম' বলা হয়।

সাধারনত প্রত্যেক কাজে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সমন্বয় রয়েছে। শ্রম বলতে সাধারন অর্থে অনিপুন পরিশ্রম (Unskilled labour) কে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে নিপুন এবং মানসিক অথবা কায়িক যে কোন পরিশ্রম যা কোন যা কোন সম্পদ বা অর্থ লাভের জন্য করা হয় তাকে 'শ্রম' বলে। আবার অনেকের মতে " শ্রম বলতে সকল ধরনের উন্নত পেশাগত দক্ষতা এবং অদক্ষ শ্রমিক ও কারিগরদের বোঝায় যারা শিক্ষা, শিল্প, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিচার প্রশাসন ও সরকারের সকল শাখায় নিয়োজিত।"

অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজও সেবাকে 'শ্রম' বলে। একজন কৃষক, জেলে বা রিক্সাচালকের শারীরিক বা ডাক্তারের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টা ও শ্রমরূপে গন্য হয়।

বস্তুত মানুষ পরিশ্রমের বিনিময়ে যা কিছু অর্জন করে তাকেই 'শ্রম' বলে। অবশ্য মানুষের সব কাজই শ্রম রূপে গন্য হয় না। কোন রূপ অর্থ উপার্জন ছাড়া কেবল স্নেহের জন্য বা আনন্দ লাভের জন্য যে পরিশ্রম করা হয় তা শ্রম নয়। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মাতাপিতার পরিশ্রম বা কষ্টকে শ্রম বলা হয় না।

শ্রম উৎপাদনে একটি আদি ও মৌলিক উপাদান। শ্রম বাদে কোন উৎপাদন সম্ভব নয়। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে শ্রমের কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

শ্রমের বৈশিষ্ট্যঃ

১. যতক্ষন শ্রমিকের জীবনীশক্তি বিদ্যমান ততক্ষন শ্রমের অস্তিত্ব থাকে। তাই শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরন বলা হয়।
২. শ্রম ক্ষনস্থায়ী যা সঞ্চয় করা য়ায় না। যে সময়টি অবহেলায় বা অন্য যেকোন ভাবে অতিবাহিত হয়, তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যা হাজার ও চেষ্টা করে কোনদিন ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।
৩. " শ্রমিক তার শ্রম বিক্রি করে মাত্র, কিন্তু নিজেকে বিক্রি করে না।" তাই বলা যায় শ্রমিক ও জ্ঞান পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ শ্রমিক থেকে শ্রমকে কখনও আলাদা করা যায় না।
৪. শ্রম যেহেতু একস্থান থেকে অন্যস্থানে, এক পেশা থেকে অন্য পেশায় স্থানান্তরিত হয়, তাই বলা যায় শ্রম একটি গতিশীল উপাদান।
৫. উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য। যেমন জমিতে ফসল ফলাতে জমির মালিকের উপস্থিতি অপরিহার্য নয় । কিন্তু উৎপাদনের সময় শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য। স্বশরীরে উপস্থিত থেকেই শ্রমের যোগান দিতে হয়।
৬. শ্রমের যোগান বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ। শ্রমের যোগান একটি দেশের জন্মহার, শিক্ষা, প্রশিক্ষন প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তাই মজুরী বাড়লেও শ্রমের যোগান দ্রুত বাড়েনা আবার মজুরী কমলেও যোগান দ্রুত কমে না।
৭. শ্রম বিক্রয়ের জন্য শ্রমিককে উৎপাদন ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হয়।
৮. শ্রম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার উৎপাদিত পন্য শ্রামকের অভাব পূরন করে। তাই শ্রমিকের অভাব পূরনের জন্য ব্যবহৃত শ্রমকে উৎপাদনের উপকরন ও উদ্দেশ্যও বলা হয়।

৯. শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা কম। যেহেতু শ্রম ক্ষনস্থায়ী আর এই ক্ষনস্থায়ী চরিত্রের জন্যই শ্রমিক নিয়োগকর্তার সাথে মজুরীর হার নিয়ে দর কষাকষি করতে পারে না।

শ্রম বিভাগ/শ্রম বিভাজন (Division of Labour)ঃ মানুষের অভাব অনেক, কিন্তু সামর্থ্য এত সীমিত যে, সে তার প্রয়োজনীয় সব জিনিস নিজে উৎপাদন করতে পারে না। বাধ্য হয়েই মানুষ আদিমকাল থেকে প্রয়োজন ও যোগ্যতার তারতম্যভেদে নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়েছে। ফল হিসেবে কেউ হয়েছে চাষী, কেউ তাঁতী আবার কেউ বা জেলে , কেউবা কামার কুমোর। এভাবে কাজের বন্টননীতিই শ্রমবিভাগ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আধুনিক কালে কোন দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে শ্রমিকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে এক একটি অংশের কাজ এক একজন বা এক একদলের ওপর ন্যস্ত করাকে 'শ্রম বিভাগ' বা শ্রমবিভাজন বলে। যেমন একটি শার্ট তৈরীর কারখানায় শ্রম বিভাগের ফলে কেউ কাপড় সংগ্রহ করে, কেউ কাপড় কাটে, কেউ শার্টের কলার তৈরি করে, কেউ হাতা তৈরি করে, কেউ সংযোগ করে, কেউ ইস্ত্রি করে, কেউ সুতা কাটে, কেউ ভাঁজ করে, কেউ প্যাকেট করে। এভাবে প্রত্যেকের সহযোগিতায় একটি শার্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। শ্রম বিভাগকে আবার বিভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়।

যথাঃ

১. পেশাগত শ্রমবিভাগ
২. জটিল শ্রমবিভাগ
৩. আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ
৪. সম্পূর্ন প্রক্রিয়ার শ্রম বিভাগ
৫. অসম্পূর্ন প্রক্রিয়ায় শ্রম বিভাগ।

<u>শ্রমের প্রয়োজনীয়তাঃ</u> সমাজে বেঁচে থাকার জন্য সবাইকে কাজ করতে হয়। শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য শারীরিক শ্রম প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের পরিবেশ দূষনমুক্ত রাখতে শ্রমের বিকল্প নেই। বিভিন্ন করখানায় নানাধরনের শ্রমিক তাঁদের শ্রম দ্বারা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করেন যেমন, গার্মেন্টস শ্রমিক গার্মেন্টস-এ কাজ করেন। আমাদের দেশের রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগই আশে গার্মেন্টসের এর মাধ্যমে। দেশের উন্নয়নে রয়েছে বিরাট ভূমিকা, আসলে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য শ্রমের গুরুত্ব অপরিহার্য, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ গুলোকে মানষের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য শ্রমের প্রয়োজন সর্বাধিক, পৃথিবীর অনেক দেশেই শ্রমিকের স্বল্পতার কারনে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব না হওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আবার দক্ষে ও পর্যাপ্ত শ্রম শক্তির সাহায্যে অনেক দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের অভাবে শ্রম নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম যথেষ্ট অবদান রাখছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি ও মূলধনকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে শ্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজকের উন্নত জাপান, চীন কিংবা মালয়েশিয়ার দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই শ্রমিকরাই এই উন্নতির মূল চালিকা শক্তি। শ্রমিকের শ্রম ছাড়া আমরা সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারি না। শ্রম কেবল সমদ্ধির উৎস নয়। তা মানুষকে দেয় সৃজন ও নির্মানের আনন্দ। মানুসের যে প্রতিভা তার বিকাশের জন্যও দরকার শ্রম। পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ গড়ে তোলে নিজের ভাগ্যকে। পৃথিবীতে যা কিছু মহান সৃষ্টি তা মূলত শ্রমেরই অবদান।

শ্রম এতিটি মানুষের মধ্যকার আশ্চর্য নিহিত শক্তি। এই শ্রমের শক্তিতেই মানুষ রচনা করেছে মানব সভ্যতার বুনিয়াদ। মানব সভ্যতা শ্রমেরই অবদান।

বিভিন্ন ধরনের শ্রমঃ শ্রমকে উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল এই দুই শ্রেনীতে ভাগ করা হয়। তবে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায় তা নিয়ে যথেষ্ঠ মতভেদ রয়েছে। তবে সাধারন দৃষ্টি কোন থেকে যে শ্রম অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করে তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। অপর পক্ষে যে শ্রম অতিরিক্ত কোন কিছু উৎপাদন করে না তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। এ ধারনা অনুযায়ী কেবল যে সমস্ত শ্রমিক কৃষি ক্ষেত্রে ও শিল্প কারখানার নিয়োজিত আছে তাদের শ্রমকে উৎপাদনশীল বলা হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায় বা অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শ্রমিক যারা নতুন কিছু উৎপাদন করে না তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে।

আবার কাহারও মতে যে শ্রমের দ্বারা বস্তুজাত কোন দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলে। উদাহরন স্বরূপ কৃষক,তাঁতী, শ্রমিকের শ্রমকে উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়।

পক্ষান্তরে যে শ্রমের সাহায্যে দৃশ্যমান বা বস্তুজাত কোন দ্রব্য উৎপাদিত হয় না সেই শ্রমকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। এই সংগানুযায়ী শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, গায়ক প্রভৃতির শ্রমকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা।

আধুনিক অর্থনীতি বিদদের মতে, যে শ্রম কোন উপযোগ সৃষ্টি করে তাকেই উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। এ ধারনানুযায়ী শ্রম বস্তুজাত ও অবস্তুজাত যাই উৎপন্ন করুক না কেন, যদি তা মানুষের অভাব পূরন করতে পারে তা হলে সেটা উৎপাদনশীল শ্রম। সুতরাং ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, গায়ক, কবি প্রভৃতি সকলের শ্রমই উৎপাদনশীল কারন সমাজে তাদের সেবার চাহিদা আছে।

অপর পক্ষে, যে শ্রম কোন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে না, যার কোন বিনিময় মূল্য নেই, তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়।

৩.২ বিভিন্ন ধরনের শ্রম সম্পর্কে সাধারন মানুষের মূল্যায়ন ঃ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ মানব সভ্যতা শ্রমেরই অবদান একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিন্তু শ্রমের প্রতি মনোভাব সাধারন মানুষের সব সময় একরকম ছিল না। আদিম সমাজে যৌথ শ্রমের মূল্য ছিল। কিন্তু সমাজে শ্রেনীবিভেদ দেখা দিলে শ্রম মর্যাদা হারাতে থাকে। প্রাচীন রোম ও মিশরে শ্রমজীবিদের সমাজিক মর্যাদা ছিল না। তাদের গন্য করা হত ক্রীতদাস হিসেবে। সামন্তযুগে কৃষকরাই শ্রমজীবির ভূমিকা পালন করেছে। তারও ছিল মর্যাদাহীণ, শোষিত ও বঞ্চিত। রুশ বিপবের পর শ্রমিক শ্রেনীর নেতৃত্বে সামাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলে শ্রমিকরা মর্যাদা পায় সবচেয়ে বেশি।

দৈহিক ও মানসিক শ্রমঃ মানব ইতহিাসে দেখা যায় পরজীবী শ্রেনীর সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় সামাজিক অসাম্য। মজুর চাষি-মুটে-কুলি, যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের অবস্থান হয় সমাজের নিচের তলায়। অন্নহীন,বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন মানবেতর জীবনহয় তাদের নিত্যসংগী, অন্যদিকে পরজীবী শ্রেনী ভুক্ত থাকে বিলাসিতায় সমাজে শ্রমজীবী মানুষের নিদারুন দুরাবস্থাই মানুরে মনে শ্রম বিমুখতার জন্ম দিয়েছে। কায়িক শ্রমের প্রতি সৃষ্টি সাধারন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের আজ্ঞা ও ঘৃনার মনোভাব।আমরা সবাই মানুষের সেবা লাভ করি। প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ যোগ্যতা ও শান্তি অনুসারে সমাজের সেবা করছে। কোনটা দৈহিক শ্রম কোনটা মানসিক শ্রম। তাই কোনটাকেই অবহেলা নেই। শ্রমজীবীদের আমরা ভালবাসা। প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করব ও বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াব। তাঁদের কাজকে আমাদের শ্রদ্ধা করা একান্ত উচিত এবং তাঁদেরকেও আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।

শ্রমজীবীদের সামাজিক মর্যাদা কম হলে তারা কাজের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাধা স্বরূপ তাই সাধারন শ্রমজীবীদের আমাদের সামাজিক মর্যাদা প্রদান করিতে হইবে।

৩.৩ সমাজে শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ঃ

শ্রম প্রতিটি মানুসের মধ্যকার আশ্চর্য নিহিত শক্তি। শ্রমের কল্যানেই মানুষ পশু জগৎ থেকে নিজেকে করেছে পৃথক। এই শ্রমের শক্তিতেই মানুষ রচনা করেছে মানব সভ্যতার বুনিয়াদ। মানুষ যে আধুনিক যন্ত্র চালায়, সুক্ষ্ম ছবি আঁকে, কিংবা অপরূপ সুরের ঝৎকার তোলে তার মুলে রেয়েছে শ্রমের অবদান। তাই শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। কোন কাজই ছোট নয়। মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকে। কোন কোন পেশার মানুষ কায়িক শ্রম বা দৈহিক পরিশ্রম করে নান কাজ করেন। তাদের শ্রমজীবী মানুষ বলে। আমাদের দেশে নানধরনের শ্রমজীবী মানুষ আছেন। যেমন- কৃষক, তাঁতী, জেলে, কামার, কুমোর,দর্জি, নাপিত, মুচি, কুলি, মাঝি, রিকসাচালক, কাঠমিস্ত্রী, বিদ্যুৎমিস্ত্রি, গার্মেন্টস, কর্মী, কারখানা, শ্রমিক ইত্যাদি।

আমরা জানি, কৃষক ফসল উৎপাদন করে আমাদের খাদ্যের যোগান দেন। তাঁতী কাপড় তৈরি করেন। জেলে মাছ ধরে আমাদের আমিষের চাহিদা মেটায়। কামার আমাদের নিত্য ব্যবহার্য লোহার জিনিস, যেমন- দা, ছুড়ি,কাঁচি, কুড়াল ইত্যাদি বানায়। রিকসাচালক রিক্সা চালান। বিভিন্ন কারখানায় নানা ধরনের শ্রমিক তাঁদের শ্রম দ্বারা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করেন যেমন- গার্মেন্টস শ্রমিক গার্মেন্টস এ কাজ করেন। আমাদের দেশের রপ্তানি আয়ের বড় অংশই আসে গার্মেন্টস এর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে এর রয়েছে বিরাট ভূমিকা। আমরা যদি একটু চিন্তা করি, তবে বুঝতে পারি সমাজে সুন্দুর জীবন যাপনের জন্য আমরা শ্রমজীবীদের উপর নির্ভরশীল সকল কাজেরই রয়েছে সমান গুরুত্ব। তাঁদের শ্রমের কারনেই সমাজ ও রাষ্ট্র তার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে। শ্রমিকের শ্রম ছাড়া আমরা সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারতাম না। আমাদের তাঁদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আমরা সবাই শ্রমজীবী মানুষের সেবা লাভ করি। তাদের ছাড়া চলতে পারি না। তাই তাঁদেরকে আমরা কখনও ছোট করে দেখি না। তাদের কোন কাজকে ছোট মনে করা উচিৎ নয়। তাই শ্রমজীবীদের যথার্থই মর্যাদা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁদের প্রতিটি কাজের প্রতি আমাদের মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্যে, সমাজ ও জাতির অগ্রগতির জন্যে শ্রম এক অপরিহার্য উপাদান, অজস্র মানুষের দেখা অদেখা শ্রমের সামাহারের উপর নির্ভরশীল আমাদের সবার জীবন ও কর্ম। দৈহিক ও মানসিক দু' ধরনের শ্রমের অদৃশ্য শ্রমের যোগ সূত্রে বাঁধা, এ কথা স্বীকার না করে আমাদের উপায় নেই যে, মজুর এবং ম্যানেজার, কৃষক এবং কৃষি অফিসার, কুলি এবং কেরানি, শিক্ষক এবং শিল্পী কারো কাজই সামাজে উপক্ষোর নয়। প্রত্যেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলেই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। এ কথা মনে রেখে সমাজের সবাইকে শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদান করিতে হবে। মেহনতি মানুষের মর্যাদার উর নির্ভর করে সমাজ ও জাতির অগ্রগতি। সোভিয়েত ইউনিয়নে, চীনে , ভিয়েতনামে এবং আরো অনেক দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার মেহনতি মানুষ পালন করে অনেক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা। বিজ্ঞানের কল্যানে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রেক্ষাপটে সমাজে শ্রমের গুরুত্ব এখন অনেক স্বীকৃত। তাই সমাজে শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদান খুবই গুরুত্ব বহন করে। শ্রম শক্তিই যে সমাজ সভ্যতার নির্মান ও সাফল্যের চাবিকাঠি, বিশ্ব আজ তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। উন্নত দেশ গুলোতে শ্রমজীবী মানুষের বহু অধিকার ও মর্যাদা ক্রমেই স্বীকৃতি লাভ করছে। আমরাও যদি সবার শ্রমকেই সমান মর্যাদা দিই তবে দেশ ও জাতি দ্রুত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে, যথার্থ কল্যান সাধিত।

উপরেউল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টই অনুধাবন করিতে পারি যে সমাজের প্রত্যেকেরই শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদান অনস্বীকার্য।

৩.৪ বাংলাদেশে শ্রম সম্পর্কে সাধারন মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

'ভূমিকা ঃ Industry is the key of Success. ইংরেজি এই বানানটির বাংলা অনুবাদ । "পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি" ,পরিশ্রম দ্বারা মানুষ সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করতে পারে। পক্ষান্তরে শ্রম বিমুখ মানুষ অনাহারে অবহেলায় পথে প্রান্তরে পরে থাকে। সমাজে প্রতিষ্টা পেতে হলে অথবা মান সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। নিজের পরিশ্রমে বেঁচে থাকতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। নিজের পরিশ্রমে বেঁচে থাকা জীবনের চরম আনন্দ এবং এর চেয়ে আত্মমর্যাদা পৃথিবীতে আর নেই।

শ্রমের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ ঃ মানুষ তার শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে অর্থ উপার্জন করে তাকে শ্রম বলে তবে স্বেচ্ছাশ্রম এবং সশ্রম বা বিনাশ্রম এর মাধ্যমে কোন অর্থ উপার্জন হয় না। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় দেশ ও আর্ত মানবতায় সেবায় শ্রমকে কাজে লাগানো হয় আর সশ্রম বা বিনাশ্রম একটি আইনগত শ্রম বা শাস্তির মাধ্যাম মানুষের শ্রমকে কাজে লাগানো হয় ।

অর্থ উপার্জন ক্ষেত্রে শ্রম দুই ভাগে ভাগ করা হয় । যথা (ক) মানসিক শ্রম (খ) কায়িক শ্রম। যে কাজে মানুষ তার জ্ঞান ও মস্তিস্ককে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করে তাকে মানসিক শ্রম বলে। আর যে শ্রমে দেহেরহাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করা হয়, তাকে দৈহিক বা কায়িক শ্রম বলে।

আমাদের দেশে শ্রম সম্পর্কে সাধারন মানুষের ধারনা ঃ

আমাদের দেশে অনেকের ধারনা নিজে নিজে কাজ করলে আত্ম সম্মানের হানি ঘটে । কিন্ত উন্নত দেশ গুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে , কায়িক শ্রমের মাধ্যমে তারা উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করে । তাই আমাদের যত উন্নয়নশীল দেশে শ্রমবিমূখতা আত্মহত্যারই নামান্তর এ ভ্রান্ত ধারনা আমাদের সমাজের জন্য যে কি ক্ষতিকর তা বলে শেষ করা যায় না। কায়িক শ্রম মোটেই আত্মসম্মানের পরিপন্থী নয় । বরং তা সমাজে প্রতিষ্টা লাভের প্রধান উপায়। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা চাকরি প্রত্যাশী। কায়িক শ্রমকে হীন ভেবে অনেকেই তা করতে আগ্রহী নয় তাদের মতে ক্ষেতের চাষী, কল কারখানার শ্রমিক কুলি মজুর সকলেই ছোট লোক, অথচ তারা জানে না এগুলো কত মহৎ কাজ, মূলত দেশ ও জাতি এ সমস্ত কাজে উপরই নির্ভরশীল।

আমাদের বর্তমান অবস্থা ঃ

শ্রমের গুরুত্বে কথা বিবেচনা করে তার মর্যাদা সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে পরিস্থিতি খুবই নৈরাজ্যজনক মনে হয় মানুষে মানুষে হাজারে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে শ্রমের প্রেক্ষিতে। সবাই এক ধরনের শ্রম দেয় না বলে তাদের মর্যাদার স্বীকৃতিতে রয়েছে ভিন্নতা , যারা তথাকথিত নিচু স্তরে কাজ করে তাদের র্মযাদা নেই। তারা সমাজে হেয় অপাংক্তেয় আর যদি বড় কাজ করে সেখানে শ্রমের পরিমান কম হলেও তারা সুবিধাভোগী , তারা সমাজের দেশের কর্ণধার। তাদের মর্যাদা অনেক বেশী । তাহলে সমাজে নিচু পর্যায়ে যারা বিদ্যমান তাদের অপরাধ কোথায়? তারা সাধারন কাজ করে বলেই কি হেয়? কিন্ত সমাজ ও দেশের সুখ- শান্তি বিধানে তাদের অবদান তো মোটেই গুরুত্বহীন নয়। তাদের ছাড়া জীবন চলে না । অথচ তাদের অবহেলা করা হয় । তাদের কাজ না পেলে জীবন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে অথচ তাদের কোন মর্যাদা নেই। এর পরিনামে অনুন্নত দেশ গুলোতে মানুষে মানুষে ব্যবধানের সৃষ্টি হয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে আসছে শ্রম বিমুখতা এখন জাতীয় জীবনে প্রবল , সুবিধা ভোগীরা সুবিধা ভোগ করতে থাকবে আর নিচু স্তরের মানুষ খেটেও জীবনে সুখ পাবে না , ফলে বিপুল সংখ্যক লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে । মৌলিক অধিকার থেকে অনেক মানুষ বঞ্চিত , শ্রমের মর্যাদা স্বীকৃত না হওয়ার ফলেই এই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । তাই সমাজ এখনও অনগ্রসর , বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের মত উন্নয়ন শীল দেশের অবস্থান বেদনাদায়ক ও মর্যাদাহীন।

আমাদের দেশে শ্রমবিমূখতা ঃ

আমাদের দেশে কায়িক শ্রমকে মর্যাদাহীন বলে বিবেচনা করা হয় কায়িক শ্রমের প্রতি প্রায় সবারই একটা বিমুখতা রয়েছে এটা ব্যক্তি ও জাতীর জীবনে উন্নতির জন্য ক্ষতিকর পরিশ্রম না করলে উন্নতি নেই একথা সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই বরং যে যত বেশি পরিশ্রম করবে । তার সুফল সে তত বেশি ভোগ করবে। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি, পরিশ্রম ছাড়া কোন কিছুই সহজলভ্য হয় না। বিশ্বে যে সব উন্নত জাতী রয়েছে তারা শ্রম দিয়ে উন্নতির শীর্ষে উঠেছে। সে আদর্শ সকল মানুষের মনে জাগ্রত হওয়া বাঞ্জনীয় , কৃষক, শ্রমিক, জেলে, কামার , কুমার , কুলি , মজুর এ ধরনের পেশার লোকেরা যদি কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে তাহলে জাতি মুখ থুবড়ে পড়বে । তাই তথাকথিত বড় লোকদের শ্রমবিমুখতা কখনই প্রশংসনীয় বিবেচিত হতে পারে না, নিজের হাতে কাজ না করার জন্য তারা দেশের উন্নতিতে বাধা হয়ে আছে জাতির অগ্রগতি হচ্ছে না , বরং জাতি পেছনের দিকে চলছে। পেশা ভিত্তিক এই শ্রেনী বিন্যাসের জন্য মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা দান সম্ভব হচ্ছে না। যারা নিজেদের রক্তদান করে সভতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে সুখের ছোঁয়া । তাদের প্রতি অবশ্য প্রদর্শন মানবতারই অপমান। এই অবস্থায় অবসান ঘটিয়ে মানুষের শ্রমের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

শ্রম সম্পর্কে সাধারন মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করা ঃ

আমাদের দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে সাধারন মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন শ্রমদান সেখানে জাতীয় উন্নতির সহায়ক । তারা শ্রমের ব্যাপারে কোন পার্থক্য বিবেনা করে না বলে তারা সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত । উন্নত দেশগুলোতে ছোট বড় ব্যবধান নেই, পেশায় পার্থক্য নেই, সবাই সমান এবং সব পেশাই মর্যাদার । এই ব্যবধান না থাকার কর্তব্য পালনে সবাই তৎপর । মানুষের মর্যাদা মানুষকে কর্মচাঞ্চল্যে উদ্বুদ্ধ করে। উন্নত দেশ গুলোর আদর্শ আমাদের দেশে অনুসরন করে মানবিক মূল্যবোধ উদ্বুদ্ধ হতে হবে। জাতীয় জীবনে উন্নতির জন্য সকল পেশার মানুষেরই বিশেষ অবদান রয়েছে বলে বিবেচনা করে সবাইকে সমান দৃষ্টি দেখতে হবে। তাহলে মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হবে এবং মানুষ নিজ নিজ কাজে উদ্বুদ্ধ হবে। পরিশ্রমের মধ্যেই জীবনের সফল্য নির্ভরশীল।

শ্রমজীবী মানুষ যদি তাদের কাজে মর্যাদা পায় তাহলে তারা জাতির জন্য আরও অবদান রাখতে সফল হবে। শ্রমের মর্যাদা দিতে হলে শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক ব্যবধান দুর করতে হবে, তাদের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দুর করতে হবে। এ ব্যাপারে সমাজের উচুঁ শ্রেনীর মানুষের দায়িত্ব অনেক বেশী । তাঁরা যদি নিজেদের অহংকার ভূলে না যান এবং নিচু স্তরের মানুষকে টেনে না তোলেন তাহলে শ্রমের মর্যাদা স্বীকৃত হবে না। তাই দেশ ও জাতীয় উন্নয়নে শ্রম সম্পর্কে উপরেবর্নিত পর্যালোচনার মাধ্যমে সাধারন মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন অত্যাবশকীয়। শ্রম দৃষ্টির পরিবর্তন হলে দেশ অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি লাভ করবে, মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, শিক্ষা উন্নতি ঘটাবে, প্রযুক্তির উন্নয়ন হবে এবং দেশের আপাময় জনসাধারন আরও পরিশ্রমী হয়। .

৩.৫ স্বেচ্ছাশ্রম ও জাতীয় উন্নয়ন ঃ

ভূমিকা ঃ পারিশ্রমিক গ্রহণ ছাড়া স্বেচ্ছায় কোন কাজে যে শ্রম দান করা হয় তাকে বলে স্বেচ্ছাশ্রম। কোন কল্যাণ মূলক বৃহৎ কাজের জন্য স্বতঃ প্রনোদিতভাবে যখন জনশক্তি সম্মিমিলিতভাবে শ্রম দানে তৎপর হয় তখন তার নাম স্বেচ্ছাশ্রম এতে স্বার্থপরতার নিদর্শন থাকে না , বরং পরোপকারে মহান ব্রতে উদ্দীপ্ত মানুষ নিজের শক্তি সমর্থ্য জনকল্যানে ও জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে পরিতৃপ্তি বোধ করে থাকে। স্বেচ্ছাশ্রম মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে, স্বেচ্ছশ্রম নিবেদিত হয় মানুষের ও দেশের কল্যাণে।

স্বেচ্ছাশ্রমের বৈশিষ্ট্যঃ মানুষ সামাজিক জীব এবং বিভিন্ন কাজের জন্য পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল । পরের সাহায্য ছাড়া একা একা বসবাস করা যেমন কষ্টকর তেমনি পরের জন্য নিজেকে কাজে না লাগানোও অমানবিক । সেজন্য স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে মানব জীবনের সামাজিকতার ও পরোপকারের বৈশিষ্ট্য রুপ লাভ করে । স্বেচ্ছাশ্রম বৃহৎ কর্মকান্ড রুপায়নে সহায়ক। অনেক দেশের পক্ষে কোন বড় কাজ করা আর্থিক ও লোকবলের দিক থেকে সমস্যার কারণ হয়। সীমিত অর্থ দিয়ে যেমন বড় কাজ করা সম্ভব হয় না। তেমনি পর্যাপ্ত জনশক্তি নিয়োজিত না হলে ব্যাপক আকারে কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। স্বেচ্ছাশ্রমে বহু সংখ্যক মানুষ পরোপকারের লক্ষ্যে কাজে নিয়োজিত হয়। ঐক্য বদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে সাধিত হয়। জাতির বৃহত্তর কল্যান। যেসব বড় কাজে অর্থ সংকুলানের ব্যবস্থা নেই সেখানে স্বেচ্ছাশ্রম কল্যান বয়ে আনতে পারে। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে জাতীয় চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে স্বদেশ প্রেম , ভ্রাতৃত্ববোধ ও জাতীয় উন্নয়ন এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠে।

জাতীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের প্রয়োজনীয়তাঃ

অর্থনৈতিক সংকট যাতে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত করতে না পারেন সে জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা দরকার। আমাদের দেশের যত দরিদ্র ও জনবহুল দেশে স্বেচ্ছশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অর্থনৈতিক ও জনশক্তির দিক থেকে অপরিহার্য, সরকারের সীমিত সম্পদে দেশের স্বেচ্ছাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অর্থতৈতিক ও জনশক্তির দিক থেকে অপরিহার্য , সরকারের সীমিত সম্পদে দেশের সর্ববিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব পর নয়, বাজেট বরাদ্দ সর্ব ক্ষেত্রে করা যায় না। আবার বরাদ্দ করা হলেও তা অপর্যাপ্ত বিবেচিত হতে পারে। কোন বড় কাজে বিপুল সংখ্যক জনশক্তি নিয়োগ করার মত আর্থিক সামর্থ্য সরকারের নেই, অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যায় দেশ বিপর্যস্ত । দেশে বেকারের সংখ্যা অত্যাধিক । সাবা বছর কাজ নেই এমন

লোকের সংখ্যা ও কম নয়। মাঠে ফসল নেই, কৃষক ঘরে বসে আছে কলকারখানা বন্ধ শ্রমিকরা বেকার , শিক্ষা প্রতিষ্টানে ছুটি , শিক্ষার্থীরা ঘুরে বেড়ায়, যদি স্বেচ্ছাশ্রমের নামে এই জনগোষ্টীকে একত্রিত করা যায় তাহলে তারা একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিনত হবে এবং তখন যে কোন কাজ সহজে সম্পাদিত হতে পারে। আমাদের স্বাধীন দেশে স্বোচ্ছাশ্রমের চেতনায় যদি জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে জাতির সংকট কাটাতে জাতি দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হবে, স্বেচ্ছাশ্রমে মানুষের কর্মবিমূখতা দূর হয়ে যায় স্বচেতনায় জাগ্রত হয় জাতি অর্থনৈতিক সমস্যা জরিত এদেশে অশিক্ষিত শিক্ষিত কর্মহীন মানুষকে যদি স্বেচ্ছাশ্রমেব নামে একত্রিত করা যায় তাহলে জাতীয় জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

স্বেচ্ছাশ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র ও জাতীয় উন্নয়ন ঃ

স্বেচ্ছাশ্রমের ধারনাটি এদেশে নতুন নয়। অনেক আগে থেকে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে যৌথভাবে বিভিন্ন কাজকর্ম বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়েছে। তবে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার কারনে স্বেচ্ছাশ্রমকে বেশি কারে কাজে লাগানোর আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। আর আমাদের জাতীয় জীবনে সম্প্রতিক কালে এর ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়েছে। আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা নিরক্ষরতার সমস্যা। শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব পর না হলে দেশের সমস্যার সমাধান হবে না। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রম সুষ্ঠভাবে কাজে লাগালে জাতির জন্য অনেক কল্যান বয়ে আনতে পারে , নিরক্ষরতা দূরীকরনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে আইন করা হয়েছে, গনশিক্ষা কার্যক্রমও চলছে কিন্তু নিরক্ষরতার সমস্যাটির ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে তা বর্তমান পদ্ধতিতে সহজে সমাধান হবে না। সে জন্য দেশের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিত জনগনকে এ ব্যাপারে স্বেচ্ছা প্রনোদিত ভাবে কাজে লাগাতে হবে। যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাক্ষরতা অভিযান চলে এবং জনগন আন্তরিভাবে তার দায়িত্ব পালন করে তাহলে অচিরেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা যাবে। দেশে কৃষিকাজে উন্নয়ন সাধনের অন্যতম প্রক্রিয়া সেচ ব্যবস্থার সুয়োগ- সুবিধা বৃদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক খাল খনন করতে হবে। এই কর্মসূচি যদি সুপরিকল্পিত ভাবে পরিচালিত হয় তাহলে দেশের সমূহ কল্যান সাধিত হবে ও জাতীয়ন উন্নয়ন ঘটবে। বন্যা নিয়ন্ত্রন ও শহর রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রম কার্যকর ভাবে উপকারে আসতে পারে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নির্মিত ব্রক্ষপুত্র বাঁধ গুরুত্বপূর্ন ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী। সড়ক নির্মাণ স্বেচ্ছাশ্রমের একটি জনপ্রিয় ক্ষেত্র গ্রামে গঞ্জে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে বহু সড়ক নির্মিত হয়েছে। মানুষ যে কেবল যৌথ ভাবে স্বেচ্ছাশ্রমে নিয়োজিত হতে পারে তা নয়, ব্যক্তিগত ভাবে স্বেচ্ছাধর্মী কার্যকর্ম গ্রহন করতে পারে। দেশে কর্মরত অনেক বেসরকারী সংস্থা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বিভিন্নমূখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের দিক প্রসারিত করছে।

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এমন দেশে স্বেচ্ছাশ্রম বিশেষ উপকারী । জনগনকে কল্যানধর্মী কাজ উদ্বুদ্ধ করার উত্তম মাধ্যম স্বেচ্ছাশ্রম। তবে এর জন্য জাতীয় সচেতনতায় প্রয়োজন। প্রয়োজন দেশপ্রেমের । সেই সাথে দরকার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের । জনগনকে সত্যিকার ভাবে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হলে এক্ষেত্রে সাফল্য আসবে । শ্রম বিমুখ জাতির মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের উদ্দীপনা সঞ্চার করা সম্ভব হলে জাতীয় জীবনে উন্নয়নের নবদিগন্তের সুচনা হবে।

৩.৬ নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ভূমিকাঃ নাগরিক শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে নাগরিক শব্দের অর্থ নগরের অধিবাসী হলেও এর প্রায়োগিক অর্থ ভিন্ন। নাগরিক সম্পর্কে এরস্টিটল তার The Politics গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তার সম্মুখে ছিল নগর রাষ্ট্রের চিত্র। তাই তিনি নগর রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মুখে রেখে নাগরিকদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন । তার মতে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তিবর্গ নাগরিক নয়। যারা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহন করে তারাই নাগরিক এরিস্টটলের কথায় " A Citizen must be an active member of a city state . অর্থাৎ " শুধু মাত্র তারাই রাষ্ট্রের নাগরিক যারা নগর রাষ্ট্রের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করে" । এখানে সক্রিয় অংশ গ্রহন অর্থ হল নগর রাষ্ট্রের বিচার সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহন, আইন প্রনয়ন ক্ষেত্রে অবদান এবং রাষ্ট্রীয় সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহন।

কিন্তু বর্তমানে নাগরিক সম্পর্কে ধারনা সম্পূর্ন বদলে গেছে। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির পদমর্যাদাই নাগরিকতা । কারন রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে তাকে কতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের ও সে অংশীদার হয়। আধুনিক কালে নাগরিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা , রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। রাষ্ট্রের নিকট থেকে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন এবং রাষ্ট্রে প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করেন। নাগরিক যদি যথাযথ ভাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন তাহলে তার নাগরিকতার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সুনাগরিকঃ মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সফল করে তুলতে পারে একজন আদর্শ ও উত্তম নাগরিক। একজন সুনাগরিকের তিনটি গুন থাকবে। যথা- (ক) বুদ্ধি (খ) আত্মসংযম এবং (গ) বিবেক সম্পন্ন।

নাগরিক অধিকার ঃ অধিকার বলতে সাধারন ভাবে ইচ্ছামতো কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায় । কিন্তু যথেচ্ছায় অধিকার হতে পারে না। কারন তাহলে কেউ কাউকে খুন করলে সেটি তার অধিকার হয়ে যায়। পৌরনীতিতে অধিকার বলেতে রাষ্ট্র কতৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুয়োগ-সুবিধাকে বোঝায় , যা ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না। অধিকার প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

যথাঃ (ক) নৈতিক অধিকার (খ) আইন গত অধিকার

(ক) নৈতিক অধিকারঃ ভিক্ষুককের ভিক্ষা পাওয়া, অসহায়ের সাহায্য পাওয়া,

এ অধিকার ভঙ্গকারীকে নিন্দা করা যায় কিন্তু দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তি দিতে পারে না।

(খ) আইনগত অধিকার ঃ যা অধিকার রাষ্ট্রের আইন দ্বারা অনুমোদিত তাকে আইনগত অধিকার বলে। এর ভঙ্গকারী শাস্তিযোগ্য হবে। আইনগত অধিকার তিন ভাগে বিভক্ত ।

যথাঃ- (১) সামাজিক অধিকার (২) রাজনৈতিক অধিকার (৩) অর্থনৈতিক অধিকার

(১) **সামাজিক অধিকারঃ** সামাজিক অধিকারে রয়েছে (ক) জীবন ধারনের অধিকার (খ) চলাফেরার অধিকার (গ) সম্পত্তিভোগের অধিকার (ঘ) চুক্তি করার অধিকার (ঙ) মতামত প্রকাশের অধিকার (চ) সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার অধিকার (ছ) সভা-সমিতির অধিকার (জ) ধর্মীয় অধিকার (ঝ) আইনের চোখে সমান অধিকার (ঞ) পরিবার গঠনের অধিকার (ট) ভাষা ও সংস্কৃতিক অধিকার (ঠ) খ্যাতি লাভের অধিকার ।

(২) **রাজনৈতিক অধিকার ঃ** রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে । (ক) বসবাসের অধিকার (খ) ভোট দানে অধিকার (গ) আবেদন করার ও সরকারের সমালোচনা করার অধিকার (ঘ) প্রবাসে নিরাপত্তা লাভের অধিকার (ঙ) সরকারী চাকুরী লাভের অধিকার ।

(৩) **অর্থনৈতিক অধিকার ঃ** অর্থনৈতিক অধিকারে রয়েছে (ক) কর্মের অধিকার (খ) ন্যায্য মজুরী লাভের অধিকার (গ) অবকাশ লাভের অধিকার (ঘ) শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার ।

নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

নাগরিকের যেমন অধিকার আছে তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্যও রয়েছে। একজন নাগরিক রাষ্ট্রের কাছে কতগুলো অধিকার লাভকরে , তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তার কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে । নাগরিক জীবন স্বার্থক ও সুন্দর করার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের এসব কর্তব্য যথাযথ ভাবে প্রালন করা উচিত।

আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে যে সব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য কোন কিছু করাকে বোঝায়। একজন নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা , কর্তব্য প্রধানত দু'প্রকার যথাঃ (ক) নৈতিক এবং (খ) আইনগত। মানুষ আগ্রহ ভরে ও নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে দায়িত্ব পালন করে তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে । আর আইনের দ্বারা আরোপিত বিধি-নিষেধের মাধ্যমে যেসব করা বা না করা হয় তাকে আইগত কর্তব্য বলে । এসব কর্তব্য পালন না করলে অধিকার ভোগ করা যায় না । কর্তব্যগুলো নিম্নরূপঃ

(১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য (২) আইন মেনে চলা (৩) নিয়মিত কর প্রদান (৪) সরকারী কাজ সুষ্টু ভাবে সম্পাদন (৫) সন্তানদের শিক্ষাদান ও রাষ্ট্রের সেবা করা (৬) ভোটাধিকার ব্যবহার করা (৭) ধর্মীয় সহিংষ্ণুতা (৮) রাষ্ট্রীয় সম্পত্তী রক্ষা করা ।

নিম্নে নাগরিকদের উপরোল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য গুলো আলোচনা করা হল ঃ

(১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঃ নিঃশর্ত ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা নাগরিকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্বও কর্তব্য । রাষ্ট্রেয় শান্তি শৃংখলা নিরাপত্তা , অখন্ডতা রক্ষা করা এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমিকতা অক্ষন্ন রাখার জন্য প্রতিটি নাগরিকের ভূমিকা পালন করা উচিত ।

(২) আইন মেনে চলা ঃ নাগরিকদের সার্বিক কল্যানের জন্যই আইন তৈরী হয়। আইনের প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। সুসভ্য জীবন যাপনের জন্য এবং দেশের উন্নতি ও শান্তির জন্য আইন মেনে চলা উচিত। আইন না মানলে রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট হয়।

(৩) নিয়মিত কর প্রদান ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় । রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছ থেকে কর গ্রহনের মাধ্যমে সে অর্থ সংগ্রহ করে। কাজেই রাষ্ট্রের কাজ সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নাগরিকদের স্বেচ্ছায় যথা সময়ে সরকারকে কর প্রদন করা কর্তব্য ।

(৪) সরকারী কাজ সুষ্টু ভাবে সম্পাদন ঃ সরকারী কাজে সরকারকে সততার সাথে সহযোগিতা করা নাগরিকদের কর্তব্য। কারন সরকারী কাজ মানে জনগনের কাজ , যাদের উপর এ কাজের ভার ন্যস্ত হয় তাদের সে কাজ সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদন করা উচিৎ।

(৫) সন্তানদের শিক্ষাদান ও রাষ্ট্রের সেবা করা ঃ সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সন্তান ও আত্মীয় পরিজনদের শিক্ষাদান করা নাগরিকদের কর্তব্য । শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় উন্নতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এছাড়াও রাষ্ট্রের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নাগরিকদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

(৬) ভোটাধিকার ব্যবহার করা ঃ সততা ও বিবেচনার সাথে ভোট দেওয়া নাগরিকদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য । অযোগ্য ও দূর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে ভোট দিলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হবার আখাঙ্খা থাকে।

(৭) ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। নিজ নিজ ধর্ম পালনের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের প্রতি সম্মান দেখানো প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।

(৮) রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রক্ষা করা ঃ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলতে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, কলখারখানা, বিদ্যুৎ , গ্যাস , বন , পাহাড়, নদ-নদী , ইত্যাদিকে বোঝায় । এগুলো যথাযথ ভাবে রক্ষনাবেক্ষন করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্বও কর্তব্য।

পরিশেষে বলা যায় স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রকে উন্নত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব ভার আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই নাগরিক হিসাবে আমাদের সম্মুখে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে

, সে বিষয়ে আমাদেরকে সদা সচেতন থাকতে হবে। দেশের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দূরীকরনে, দুঃখ-দারিদ্র্য লাঘব কল্পে প্রত্যেক নাগরিকেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনে যারা অনিহা প্রকাশ করে তারা যথার্থ নাগরিক নয়; বরং বলা যায় তারা দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

৩.৭ দেশীয় পণ্য ব্যবহার ঃ

আলোচনার শুরুতে পণ্য কি এ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে দ্রব্য সম্পর্কে ধারনা থাকা প্রয়োজন।

দ্রব্যঃ যে সকল বস্তু বা জিনিস মানুষের অভাব পুরন করতে পারে তাকে দ্রব্য বলে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আলো, বাতাস, গায়কের গান, ডাক্তারের সেবা ইত্যাদি। তাই দ্রব্য বস্তুগত হতে পারে আবার অবস্তুগত হতে পারে।

পন্যঃ সাধারনত দ্রব্য ও পণ্য শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশেষনে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যে সমস্ত জিনিসের উপযোগ আছে এবং যা মানুষের অভাব পূরন করতে পারে তাকে দ্রব্য বলে। পক্ষান্তরে যে সকল দ্রব্য বানিজ্যিক ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয় তাকে অর্থনীতিতে পন্য (Commodity) বলে। পন্যের সাথে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারটি জড়িত। যেমন- পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরনের জন্য যখন বাড়িতে কোন জিনিস রান্না করা হয় তাকে দ্রব্য বলা হয়। কিন্তু এ সব জিনিস যখন বানিজ্যিক ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে হোটেল তা রেস্তোরায় রান্না করে পরিবেশন করা হয় তখন তাকে পন্য বলা হয়। সুতরাং বানিজ্যিক ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীকে পন্য বলে।

দেশীয় পণ্যঃ দেশীয় কাঁচামাল, দেশীয় শ্রমিক,দেশীয় মুলধন ও দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হয় তাকে দেশীয় পণ্য বলে। যেমন বাংলাদেশে উৎপাদিত ধান, পাট,তামাক,বস্ত্র, মৃৎসামগ্রী, কাঠের তৈরি আসবাব পত্র, কাঁচ শিল্প থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী এগুলো দেশীয় পণ্য।

দেশীয় পণ্যের উৎস সমূহঃ আমরা বাংলাদেশে যে সমস্ত দেশীয় উৎস থেকে পণ্য সামগ্রী পেয়ে থাকি তা নিম্নরূপঃ-

- বৃহদায়তন শিল্প পণ্য- পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী, ব্যাগ,থলে,বস্তা,সুতলী,কার্পেট ইত্যাদি।
- সমুদ্র শিল্প থেকে- বিভিন্ন ধরনের সুতা,কাপড়,তৈরি পোশাক।
- সার শিল্প থেকে- বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার।
- চিনি শিল্প থেকে- চিনি, মেথিলেটেড স্পিরিট।
- সিমেন্ট শিল্প থেকে- সিমেন্ট।
- লৌহ ও ইস্পাত শিল্প- বড়, তারকাটা, বিভিন্ন যন্ত্র পাতি।
- মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প থেকে- চামড়া ও চামড়া জাত দ্রব্য যেমন ব্যাগ, জুতা, স্যান্ডেল, বেল্ট ইত্যাদি।
- প্লাষ্টিক ও নাইলন শিল্পের তৈরি বিভিন্ন উপকরন ও খেলনার সামগ্রী কুটির শিল্প থেকে প্রাপ্ত দেশীয় পণ্য সমুহ যেমন- তাঁত শিল্প থেকে শাড়ি, লুঙ্গী, গামছা, তোয়ালা খদ্দরের কাপড়।
- রেশম শিল্প থেকে- শাড়ি, চাদর, জমার কাপড়।
- বাঁশ ও বেত শিল্প- বাঁশ ও বেতেরে তৈরি চেয়ার, টেবিল, মাদুর,শীতল পাটি, ঝুড়ি।
- কাঁসা ও পিতল থেকে- থালা, বাটি, ঘটি, কলস।
- মৃৎ শিল্প থেকে- মাটির হাড়ি, কলস, থালা, বাসন, পুতুল, খেলনার সামগ্রী, ঘর সাজানোর বিভিন্ন উপকরন।
- কাঠ শিল্প- কাঠের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, বাক্স,আলমারী, খাট, আসবাবপত্র, গৃহনির্মানের সরঞ্জামাদি, লাঙ্গল নৌকা ইত্যাদি।
- সাবান শিল্প- সাবান, ডিটারজেন্ট।
- বিড়ি শিল্প- বিড়ি,সিগারেট,জর্দা,গুল ইত্যাদি।
- লবন শিল্প- লবন।

- শঙ্খ ও হস্তিদন্ত শিল্প- চুড়ি, বোতাম, চিরুনী, খেলনা।
- ধাতব শিল্প- স্বর্ন ও রৌপ্যের তৈরী অলংকারদি।
- পাটজাত শিল্প- দড়ি, সিকা, রশি,ব্যাগ বিভিন্ন সাজানোর সামগ্রী।
- নারিকেলের ছোবড়া, দড়ি, পাপোশ, ব্রাস।
- অন্যান্য শিল্প- দুধ হতে দধি, ছানা, পনির, মাখন,ঘি মিষ্টি তৈরী, বই বাঁধানো, তেলের ঘানি চাল ও গম পেষার কল।
- কৃষিজাত পন্য- বিভিন্ন ফস্‌ল, মৎস্য, পশু, বনজ, খনিজসম্পদ ইত্যাদি।

১. **দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সদব্যবহার ঃ** বাংলাদেশ প্রকৃতিক সম্পদে ভরপুর। দেশীয় পন্য ব্যবহার করলে বৃহৎ, মাঝারি ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পগুলো প্রয়োজনীয় পরিমান দ্রব্য উৎপাদনে সচেষ্ট হবে। ফলে দেশের কাঁচামাল যেমন- পাট,চা, চামড়া, বাঁশ, বেত, লৌহ প্রাকৃতিক গ্যাস, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি উপকরনের সদব্যবহার হবে।

২. উৎপাদন বৃদ্ধিঃ দেশীয় পন্য ব্যবহারের ফলে দেশীয় উৎপাদনকারী আরও বেশী পরিমান দ্রব্য যোগান দেওয়ার জন্য বেশী পরিমান উৎপাদনে আগ্রহী হবে।

৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিঃ দেশীয় পন্য ব্যবহারের ফলে দেশীয় পন্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলো বিকশিত হবে। ফলে অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪. গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিঃ গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের অধিকাংশ মহিলাদের কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। দেশীয় পন্য ব্যবহারের ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোর বিকাশ সাধনের সাথেই সাথেই গ্রামীন মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৫. কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাসঃ বাংলাদেশের জনগন যদি বেশী বেশী পরিমানে দেশীয় পন্য ব্যবহার করে তাহলে দেশীয় শিল্পগুলোর দ্রুত বিকাশ সাধিত হবে। ফলে অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ঐ সব শিল্পে যা কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ অনেকটাই কমিয়ে আনবে।

৬. মূলধন গঠনঃ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার জন্য মুলধন গঠন অপরিহার্য। আমরা যদি দেশীয় পন্য ব্যবহার করি তাহলে আমাদের বিদেশ থেকে আর কোন দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করতে হবে না। ফলে মুলধন ব্যয় হবে না বরং বিশাল পরিমান মুলধন গঠন করে আমরা দেশে বড় বড় শিল্প কলকারখানা স্থাপন করে উন্নতির শীর্ষে পৌছাতে সাহায্য করতে পারি।

৭. পরনির্ভরশীলতা হ্রাসঃ আমরা প্রতিবৎসরই বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যদ্রব্য, পূঁজিদ্রব্য এবং বিলাসজাত দ্রব্য আমাদানী করে থাকি। এতে করে আমাদেরকে সর্বদাই পরমুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের দেশীয় পন্য ব্যবহার করি তাহলে পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৮. আমদানীর পরিমান হ্রাসঃ দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের ফলে আমাদের আমদানির পরিমান হ্রাস পাবে। ফলে প্রচুর মূলধনের সাশ্রয় হবে যার সাহায্যে আমরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে পারব।

৯. প্রযুক্তিগত উন্নয়নঃ দেশীয় পন্য ব্যবহারের ফলে দেশে বৃহৎ, মাঝারি বা ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ সাধিত হবে ফলে এসব শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়নও সম্ভব হবে।

১০. শিশু শিল্পকে সংরক্ষন করাঃ দেশে বিকাশমান শিশু শিল্পগুলোকে ব্যপকভাবে সহায়তা করার জন্য দেশীয় পন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন । কারন হাটি হাটি পা পা করে অগ্রসর মান শিল্পগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার না করলে তা বিদেশী উন্নতমানের পন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না।

১১. জীবনযাত্রার মান উন্নয়নঃ জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী আর দেশীয় উৎপাদিত পন্য ব্যবহারের মাধ্যমে তা সম্ভব।

১২. সুষম উন্নয়নঃ বাংলাদেশের সব অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের জন্য অবশ্যই দেশীয় উৎপাদিত পন্য ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে।

১৩. জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষনঃ সর্বপরি আমরা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষন, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সংরক্ষনের জন্য আমাদের দেশীয়পন্য ব্যবহার করা অত্যাবশ্যাক।

৩.৮ উন্নয়ন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ঃ

সাধারনত উন্নয়ন বলতে আমরা কোন একটি বস্তু বা বিষয়ের একটি খারাপ যা লাজুক অবস্থা থেকে ভাল বা উন্নত বা উন্নত পর্যায়ের একটি উত্তরনকেই বুঝে থাকি। আর আঞ্চলিক উন্নয়ন বলতে কোন একটি অঞ্চলের একটি খারাপ বা দূর্বল অবস্থা থেকে উন্নত পর্যায়ে উত্তরনকেই আঞ্চলিক উন্নয়ন বলতে পারি। উন্নয়ন মুলত দীর্ঘ সময়ব্যাপি একটি দেশের দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকে বুঝায়। উন্নয়নের ফলে দেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন তথা জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। তাইমূলত উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বুঝানো হয়। আর তাই বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগন বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গা প্রদান করেছেন।

যেমন- অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ও ব্যাট্রিক বলেন, " যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন দেশের বা অঞ্চলের জনগন সেখানকার প্রাপ্ত সম্পদের সদ্যবহারের মাধ্যমে অব্যাহত ভাবে মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ঠ হয়, তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।"

অর্থনীতিবিদ স্াইডার বলেন " অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে মাধাপিছু উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদী তা অব্যাহত বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝায়।"

এর আলোকে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরে একটি দেশের দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ও মাথাপিছু প্রকৃতি আয় বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও প্রয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও সামাজিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয়। কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রাপ্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তার জনগনের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও প্রয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোর উন্নয়ন সর্বোপরি জনগনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করে উন্নয়নের অনুকুলে আনোয়নকে আঞ্চলিক উন্নয়ন বলে।

৩.৯ সম্পদ, স্থানীয় সম্পদ, সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার কৌশল ঃ

সাধারনত সম্পদ বলতে ধন সম্পত্তি বা টাকা পয়সাকে বুঝায়, কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে সব ধরনের অর্থনৈতিক দ্রব্যকে বুঝায়। যে সমস্ত দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ এবং যা মানুষের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম তাকেই সম্পদ বলা হয়। অবাধলভ্য সামগ্রীকে সম্পদ বলা যাবে না। যেমন বাতাসের উপযোগ আছে কিন্তু তার যোগান অসীম বলে তাকে সম্পদ বলা যাবে না। অর্থনীতিতে সম্পদ হতে হলে এর বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। এটা বস্তুগত হতে পারে যেমন ঘর-বাড়ি, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি। আবার তা অবস্তুগত হতে পারে যেমন ব্যবসায়ের সুনাম। সুতরাং যে সমস্ত দ্রব্যের উপযোগ আছে ও যোগান সীমাবদ্ধ এবং যার বাহ্যিকতা আছে ও হস্তান্তর যোগ্য তাকেই অর্থনীতিতে সম্পদ বলে। উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে আমরা সম্পদের নিম্নোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই।

যথাঃ-

১. উপযোগ (Utility)
২. অপ্রাচুর্যতা (Scarcity)
৩. বাহ্যিকতা (Externality)
৪. হস্তান্তর যোগ্যতা (Transferablity)

সম্পদের প্রকারভেদ ঃ

১. ব্যক্তিগত সম্পদঃ ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাধীনে যে সব বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। যেমন কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব জমি, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, শিল্প কারখানা ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদ।

২. সমষ্টিগত সম্পদঃ যে সব সম্পদ ভোগ, ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব সমাজে বসবাসকারী জনগনের হাতে যৌথভাবে অর্পিত হয় তাকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। যেমন- রাস্তাঘাট, রেলপথ, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পার্ক গনপাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি সমষ্টিগত সম্পদ।

৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদঃ একটি দেশের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মালিকানায় যে সব সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে একত্রে সমষ্টিগত সম্পদ বলে।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পদঃ যেসব সম্পদের কোন রাষ্ট্রই একক মালিক নয় বরং বিশ্বের সব রাষ্ট্রই তা সমভাবে ভোগ বা ব্যবহার করতে পারে এবং এর রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব সব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হয় যেগুলোকে আন্তর্জাতিক সম্পদ বলে। যেমনঃ সাগর, মহাসাগর,প্রযুক্তিবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জাতিসংঘের সদর দপ্তর ইত্যাদি। সম্পদের অপর একটি ভাগ হিসাবে উপরোক্ত প্রথম তিন প্রকার সম্পদকে আমরা স্থানীয় সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। নিম্নে আমরা স্থানীয় সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব। স্থানীয় সম্পদ বলতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রকৃতি প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা বুঝে থাকি। যে সকল সম্পদ প্রকৃতির অবাধ দান তাহাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, ভূ-প্রকৃতি, জমি, জমির উর্বরতা,নদ-নদী,কৃষিজ সম্পদ. খনিজ সম্পদ. বনজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, শক্তি সম্পদ পশু সম্পদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমান যত বেশী সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভবনাও তত বেশী। যে দেশে কম তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাও তত কম। বাংলাদেশেও প্রাকৃতিকভাবে দেশীয় সম্পদে ভরপুর। এসকল দেশীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারি।

বাংলাদেশের এসব দেশীয় সম্পদের গুরুত্ব নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল-

১. জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতঃ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ সহায়ক। দক্ষিন পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যার সাহয্যে আমাদের কৃষিতে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়।

২. জমি ও জমির উর্বরতাঃ স্থানীয় সম্পদের মধ্যে জমি ও জমির উর্বরতা অন্যতম যা কৃষিকাজের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই সমভূমি। তাই পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র এবং উহাদের উপনদী ও শাখানদী দ্বারা বাহিত পলিমাটি আমাদের কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত।

৩. নদ-নদীঃ বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী রহিয়াছে। পদ্মা, মেঘনা,যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, তিস্তা, গড়াই, ধরলা প্রভৃতি নদ-নদী দ্বারা বাংলাদেশ বেষ্টিত। এই সকল নদী উৎপত্তি স্থল থেকে পলিমাটি বহিয়া আনিয়া বাংলাদেশের নিম্নভূমিকে আরও উর্বর করে যা কৃষিকাজে অত্যন্ত সহায়ক হয়।

৪. কৃষিজ সম্পদঃ বাংলাদেশ কৃষি সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের জাতীয় আয় অর্জন কৃষির যতেষ্ঠ আবদান আছে। আবার অধিকাংশ কৃষির উৎপাদিত দ্রব্য দেশীয় শিল্পোগুলোর কাঁচামালের চাহিদা পুরনসহ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা আনয়ন করে। ধান, পাট.ইক্ষু. তামাক, তুলা, ডাল, চা, গম, আল, তৈলবীজ, প্রভৃতি এদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

৫. বনজ সম্পদঃ বাংলাদেশ বনজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের মোট ভূ-ভাগের শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ বনভূমি রহিয়াছে। এর মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চল, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চল, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের বনভূমি ও দিনাজপুর ও রংপুরের বরেন্দ্র বনাঞ্চল উলেখযোগ্য। এসকল বনভুমি থেকে আমরা জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র নির্মানের কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম, গোলপাতা ইত্যাদি আহরিত হয়।

৬. খনিজ সম্পদঃ বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নহে। বর্তমানে বাংলাদেশে যেসকল খনিজ সম্পদ পাওয়া গেছে তন্মধ্যে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, গন্ধক, সিলিকা বালু, চীনামাটি, কঠিন শিলা

প্রভৃতি উলেখযোগ্য। তবে আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমানে খনিজ সম্পদ না থাকার কারনে শিল্পোন্নয়ন কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে।

৭. প্রানিজ সম্পদঃ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমানে প্রানিজ সম্পদ রহিয়াছে। এদের কতকগুলো গৃহপালিত এবং কতকগুলো বন্য। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, হাঁস, মুরগী, কবুতর এবং বন্যপ্রানীর মধ্যে, বাঘ,সিংহ, হরিন, জেব্রা, বানর বিভিন্ন ধরনের পাখি ইত্যাদি প্রধান। এই সকল বন্য ও গৃহপালিত পশু ও পাখি আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করে, কৃষিকাজে সহায়তা করে সর্বোপরি দুধ, ডিম, মাংস, সরবরাহ করে আমাদের আমিষের চাহিদা পুরন করে।

৮. মৎস্য সম্পদঃ দেশীয় সম্পদের মধ্যে আমাদের অন্যতম সম্পদ হচ্ছে মাছ। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল,হাওড়, পুকুর দীঘি রহিয়াছে। এই সকল জলাশয়ে রুই,কাতলা, মৃগেল, কই, মাগুর ,শিং, পাবদা কার্ফ জাতীয় মাছ, পুঁটি, কার্ফু ইত্যাদি মাছ রহিয়াছে। পক্ষন্তরে উপকুলীয় অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমানে ইলিশ,চিংড়ি এবং প্রচুর সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। এই সকল মাছ যেমন আমাদের আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরন করে অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকার মাছ ও মাছজাত দ্রব্য বিক্রয় করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছি।

৯. মানব সম্পদঃ দেশীয় সম্পদগুলোর মধ্যে আর একটি অন্যতম সম্পদ হল মানব সম্পদ। বাংলাদেশে রয়েছে বিপুল পরিমান জনসংখ্যা। এই বিপুল জনসংখ্যাকে যদি আমরা জনশক্তিকে রুপান্তর করতে পারি তাহলে এগুলোর সাহায্যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে। তাছাড়াও মানব সম্পদ বিদেশে রপ্তানী করে আমরা প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারি।

১০. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোঃ এই ভাবে বাংলাদেশের দেশীয় সম্পদগুলোকে যদি আরও সুষ্ঠ ভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

সম্পদ আহরন ও ব্যবহার কৌশলঃ

সম্পদ আহরন বলতে আমরা বুঝি যে, আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রহিয়াছে তা সংগ্রহ করা ও তার ব্যবহার কৌশল আবিষ্কার করা।

প্রথমত-আমাদের ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী যে জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত আছে তার আমরা সদব্যবহার করব। এক্ষেত্রে যে যে ফসল যে যে জলবায়ুর উপর নির্ভলশীল আমরা সেই সেই ফসল উৎপাদন করব। বৃষ্টিপাতের মৌসমে যে ফসল গ্রহন করব। সুতরাং জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতকে আমরা সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারব।

দ্বিতীয়ত-জমি ও জমির উর্বরতা এই সম্পদকে আমরা রক্ষা করার চেষ্ঠা করব। জমির উর্বরতা যাতে হ্রাস না পায় এর জন্য জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমান সার (জৈব বা অজৈব) প্রয়োগ করব। জমির ক্ষয় রোধ করা কৌশল অবলম্বন করতে হবে তাহলে আমরা জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমান ফসল উৎপাদান করে দেশের খাদ্যের চাহিদা পুরন করতে পারব।

তৃতীয়ত-আমাদের যে নদ নদী সম্পদগুলো আছে তা থেকে আমরা পানি সম্পদকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে পারি। নদীগুলোতে মৎস্য চাষ করে সেখানে আমরা প্রচুর পরিমানে অর্থের উপার্জনের উপায় বের করতে পারি। নদীগুলো যাতে শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে না যায় তার জন্য ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন বোধে নদীগুলোর গতিপথের পরিবর্তন করে শুষ্ক অঞ্চলে ফসলের ক্ষেতে পানিসেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চতুর্থত- কৃষিজ সম্পদ আহরনের জন্য আমরা কৃষি জমিগুলোকে ভালভাবে চাষাবাদ করে সার, সেচ, ভালবীজ, কীটনাশক ঔষধ সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে অনেক বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারব। কৃষি থেকে আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করতে পারি। কৃষি পন্নের মধ্যে ধান, পাট, গম, ভূট্টা, তুলা,ইক্ষু, তামাক, চা, চামড়া, তৈলবীজ, আলু প্রভৃতি প্রধান। এ সকল সম্পদের ব্যবহার কৌশল হিসাবে আমরা কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসাবে পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প , চা শিল্প, ব্যাগ, সুটকেট বা জুতা শিল্প,তৈল শিল্প, ময়দা ও আটা শিল্প চিনি শিল্প, বিড়ি বা সিগারেট শিল্প ইত্যাদি ব্যাপক হারে গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চমত- বনজ সম্পদ আহরনের জন্য প্রচুর পরিমান বনজ সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক বনের সংখ্যা অত্যন্ত কম আবার যেগুলো রয়েছে তা দিন দিন উজার হয়ে যাচ্ছে। তাই যেগুলো রয়েছে তা সুষ্ঠভাবে সংরক্ষন করতে হবে এবং নতুন ভাবে আমাদের পতিত ও খাস জমিগুলোতে কৃত্রিমভাবে বনায়ন করতে হবে। বাড়ির আশেপাশের পতিত ও ফাঁকা জমিতে করতে হবে। বাড়ির আশেপাশের পতিত ও ফাঁকা জমিতে ফলজ,বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন করতে হবে। বাংলাদেশের নদী উপত্যকা, উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চল এবং সমুদ্র উপকুলীয় অঞ্চলে পর্যাপ্ত বনভূমি সৃষ্টি করতে হবে। বেপরোয়াভাবে বৃক্ষ কর্তন রোধ করতে হবে। জনসাধারনকে বৃক্ষরোপনের জন্য জনগনকে বিনামূল্যে অথবা কমমূল্যে বৃক্ষের চারা বিতরন করতে হবে। সর্বোপরি বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষনের জন্য পর্যাপ্ত গবেষনার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে বনভূমি সৃষ্টি হলে আমরা সেখান থেকে পরিবেশগত সুবিধা পাব। পশুপাখিদের অভয়ারন্য সৃষ্টি হবে। বনের কাঠ আমরা জ্বালানী আসবাবপত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারব।

ষষ্ঠত- খনিজ সম্পদ আহরন অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তদুপরি আমাদের দেশে যে সব খনিজ সম্পদ রয়েছে তা উত্তোলনের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। পাশাপাশি এসব খনিজ সম্পদ ব্যবহার করা যায় এরকম শিল্প স্থাপনের কৌশল আমরা অবলম্বন করতে পারি। আবার কিছু কিছু খনিজ সম্পদ আমরা বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রাও উপার্জন করতে পারি। শিল্প কলকারখানার জ্বালানী, শিল্পের কাটামাল, কৃষির উন্নতি , বিদ্যুত উৎপাদন গৃহস্থালী কার্যে, বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনে, সর্বোপরি কর্মসংস্থানের উৎস হিসাবে আমরা খনিজ সম্পদ ব্যবহার করতে পারি।

সপ্তমত- প্রানীজ সম্পদ আহরনের জন্য প্রচুর পরিমানে গৃংপালিত পশু ও পাখি পালন করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে যদি বাড়ি বাড়ি পশু ও পাখি লালন পালন করা হয় তবে এই সম্পদ প্রচুর পরিমানে আহরন করা সম্পদ। বেসরকারী বা সরকারী পর্যায়ে গরু ছাগলের খামার ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় যদি প্রচুর পরিমানে ডিম, দুধ, মাংস উৎপাদন করা যায় তবে দেশে আমিষের চাহিদা পুরন সহ বিদেশে রপ্তানী করেও প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব। আধার অনেক সময় পশু সম্পদ আমাদের চাষাবাদ কাজ ছাড়াও পন্য পরিবহনে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে।

অষ্টমত- বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এখানে রয়েছে বড় বড় নদী , শাখানদী, উপনদী, হাওড়, বিল, দীঘি, জলাশয় ইত্যাদি। এ সকল উৎস থেকে আমরা প্রচুর পরিমানে মৎস্য সম্পদ আহরন করতে পারে। তাছাড়াও সমুদ্র উপকুলীয় অঞ্চল থেকে অনেক সামুদ্রিক মাছ ও শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি সম্পদ আহরন করতে পারি। আমাদের দেশে এসব উৎসগুলোতে যদি আমরা সরকারী বা বেসরকারী ভাবে মৎস্য চাষ করতে পারি তাহলে দেশে আমিষের চাহিদা পুরনের পরেও আমরা বিদেশে পন্য রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা উপার্জন করতে পারি। পরিশেষে আমাদের দেশে যে বিপুল পরিমান জনগোষ্ঠি রয়েছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করতে পারলে দেশের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বেকার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

উপসংহারে আমরা এই সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে, সম্পদ আহরন ও তা ব্যবহার কৌশলের উপর একটি দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক কল্যাণ বা উন্নয়ন নির্ভর করে।

৩.১০ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ঃ

আধুনিক কালে সরকারী কর্মকান্ডের সম্প্রসারনের ফলে সরকারী প্রশাসক তথা আমলাদের সংখ্যাই কেবল নয়, তাদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আর সে সাথে প্রশাসকদের কর্মকান্ডের বিষয়ে দায়িত্বশীলতা প্রশ্নটিও অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে এবং সরকারের সাফল্য কেবল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতার উপর ও নির্ভর করেনা , এটি তাদের দায়িত্বশীলতার উপর ও নির্ভর করে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আদর্শ ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থেই প্রশাসনিক জবাব দিহিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।

স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা বলতে মূলতঃ কোন পদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য জবাবদিহি থাকার বাধ্যবাধকতাকেই বুঝায়। এতদসত্ত্বেও 'স্বচ্ছতা' বা 'দায়িত্বশীল' বা 'জবাবদিহি' শব্দটিও আরও অর্থ রয়েছে। যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে 'দায়িত্বশীল ' বলে উলেখ করি তখন আমরা এটাই বুঝাই যে, তিনি বিশ্বস্ত বা কোন টেকনিক্যাল বিষয়ে তার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। আবার দায়িত্বশীল কর্মচারী বলতে এমন একজনকে বুঝায় যিনিতার কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে কোন পেশাগত , গোষ্টীগত বা আইগত মানদন্ড মেনে চলেন। তাছাড়া দায়িত্বশীলতা বা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বলতে কর্তৃত্বের উৎস হিসাবে বিবেচিত এমন কোন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য ও বুঝাতে পারে উপরন্তু জবাব দিহিতা বলতে কোন ব্যক্তির নিজের কাজ কর্মের জন্য অপর কোন ব্যক্তির প্রতি কৈফিয়ৎ প্রদানের বাধ্যবাধকতা বুঝাতে পারে।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা অর্থ এই যে, কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ তার উপর অর্পিত স্ববিবেচনা প্রসূত কর্তৃত্ব প্রয়োগের বিষয়ে অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সন্তোষজনক জবাব প্রদানে বাধ্য থাকবে । অন্যথয় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। এসব ব্যবহার মধ্যে পদাপসারন, পদাবনতি, পদোন্নতি, বিশেষ অধিকার হতে বকনা, নিন্দা জ্ঞাপন, ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্তকরন প্রভৃতি।

জবাবদিহিতা এমন এক ব্যবস্থা নির্দেশ করে যাতে যারা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তারা কতিপয় বাহ্যিক উপায়ে এবং অভ্যন্তরীন মূল্যবোধ বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। সনাতন, আইগত এবং আনুষ্ঠানিক দিক থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রন ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করাকে বোঝায়। আর বাহ্যিক অর্থে জবাবাদিহিতার অর্থ হচ্ছে সম্পদের ব্যবহার ও কতৃত্বের জন্য দায়ী থাকা।

বিভিন্ন প্রকার স্বচ্চতা ও জবাব দিহিতা করতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্থিক জবাবদিহিতা, আইনগত জবাবদিহিতা কর্মসূচী সংক্রান্ত দায়িত্বশীলতা, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত জবাবদিহিতা, ফলাফল সংক্রান্ত জবাব দিহিতা।

জবাবদিহিতার সাথে সম্পৃক্ত অভ্যন্তরীন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস দায়িত্বশীলতার বৃত্তিগত, নৈতিক ও বাস্তব ভিত্তিক দিক নির্দেশ দেয় যা একজন প্রশাসককে তার নীতি ও আর্দশ কর্মকান্ডে যোগান দেয় । উদাহরন স্বরুপ, একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যক্তিগত লাভ বা সুবিধা দ্বারা তাড়িত হবেন না। সরকারের নির্বাহী বিভাগকে আইন বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল করা সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক প্রতিষ্ঠিত বিষয়। আইন বিভাগ কর্তৃক বাজেট নিয়ন্ত্রন ও পাস করা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য চালানোর ক্ষমতা উভয় সরকার ব্যবস্থাতেই যথেষ্ঠ গুরুত্ব পেয়ে থাকে ।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার তাৎপর্য ঃ

আধুনিক কালে সরকারী কর্মকান্ডের অত্যাধিক প্রসারের ফলে আমলাতন্ত্রেরক্ষতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আমলাতন্ত্র যেন ক্রমেই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। ফলে গনতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে কিভাবে অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। উদ্দেশ্য প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল করে তোলা। আমলাতন্ত্র ও সরকারী কর্মকর্তাদের অত্যাধিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখার জন্য তাদের কর্মকান্ড সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নীতমালা প্রনিত হয়েছে। এ বিধি- বিধান ও নীতিমালা নির্বাচিত এবং সরকারের স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা অর্জনের উপায় ঃ

১। **রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা ঃ** প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা কিংবা জবাবদিহিতা অর্জন করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি তথা জন প্রতিনিধিদের নিকট জবাবদিহি রাখার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সব প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উচিত নিরপেক্ষতার সহিত কাজ করে যাওয়া। যে দলই ক্ষমতাসীন হোকনা কেন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উচিত বিশ্বস্ততার সাথে উক্ত দলের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে যাওয়া। প্রশাসকদের উপর রাজনৈতিক জবাব দিহিতা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আইন সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আইন সভার নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিতি হয়। আইন সভা সাধারনত অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, বিভিন্ন প্রকার প্রভাব উথাপন করে এবং বিতর্কে অংশ গ্রহন করে শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রন চর্চা করে থাকে। তাছাড়া আইন সভা ন্যায়পাল পদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন কর্তৃপক্ষের উপর নিয়ন্ত্রন চর্চা করে থাকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যাতে আইনগত সমতার মধ্যে থেকে জনস্বার্থে কাজ করে তা দেখাশুনা করাই ন্যায়পালের কাজ।

২। **আইন বিভাগের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ঃ**

প্রশাসনের উদ্ধর্তন কর্মকর্তা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। আর এ উধ্বর্তন কর্মকর্তার কাছে নিম্নশ্রেনীর সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী জবাব দিহি করতে বাধ্য থাকেন তার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য। নীচে এর বিস্তারিত দিক তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) লিখিত রির্পোট বা প্রতিবেদন ঃ প্রত্যেক অর্ধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারী তার সকল কার্যাবলীর হিসাব সম্বলিত রির্পোট উধ্বর্তন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন। এ রির্পোটের মাধ্যমে সে উদ্ধর্তন কর্মকর্তার নিকট দায়বদ্ধ থাকে।

(খ) রুলস অব বিজনেস ঃ এ নীতি অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্মকান্ড কে কার নিকট দায়ী থাকবে তা নির্ধারণ করা হয় এবং এতে কে কতটুকু সক্ষমতার অধিকারী তাও সঠিকভাবে নির্ধারন করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে জবাব দিহতা নিশ্চিত করা যায় ।

৩। **অডিটের মাধ্যমে ঃ**

সরকারী অর্থ নির্দিষ্ট খাতে সুষ্ঠভাবে ব্যয় করার জন্য আইন বিভাগের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ সাধারনত বিভিন্ন অডিট কমিটির মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এ কমিটির মাধ্যমে জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

৪। প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের মাধ্যমে ঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদে উলেখ আছে । সংসদে আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠিত করলে এর আওতাভুক্ত কোন ব্যাপারে অন্য আদালত কোন রুপ আদেশ প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।

৫। বিচার বিভাগের মাধ্যমে ঃ

বিচার বিভাগের মাধ্যমে জবাবদিহিতা বলতে গুরুত্বপূর্ন আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন করে গৃহীত সিদ্ধান্তের বৈধতা যাচাই করাকে বুঝায়। এ ছাড়া কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা তাদের উপর অর্পিত ক্ষতার অপব্যবহার করলে বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

৩.১১ ঃ শ্রম ও উন্নয়ন ঃ

শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করাকে শ্রম বলে। শ্রম ছাড়া কোন দেশ জাতি কিংবা কোন ব্যাক্তির উন্নতি করা সম্ভব না। শ্রম দুই প্রকার কায়িক ও মানসিক শ্রম উভয় প্রকার শ্রমই সুফল বয়ে আনে। জগতের সুখ শান্তি ঐশ্বর্য সম্মান প্রতিপার্দ্ধ সবই এই শ্রমের উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসাবিদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ ও শিল্পীর পরিশ্রম প্রধানত মানসিক। তবে তাদের এই মানসিক শ্রমকে বাস্তবে রুপায়িত করতে যেয়ে তারা সবাই কায়িক শ্রমেও অংশ গ্রহন করেন। মোট কথা আজকের সমাজে যারা ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, কবি সাহিত্যেক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ তাদের জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তারা পরিশ্রম করে আজ এই অবস্থানে এসেছে। সর্বোপরি বলা যায়, Industry is the Mother of good luck [পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসুতি]

অধ্যায়-৪ঃ
চরিত্র গঠন ও নৈতিকতাবোধ

৪.১ চরিত্রের সংজ্ঞা ও সৎ চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষ সারা জীবন ধরে যা কিছু অর্জন করে তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে তার চারিত্রিক গুণাবলী। মানুষ কাজে ও কর্মে সকল প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান সোপান হল তার চরিত্র। ইংরেজীতে একটি বহুল প্রচারিত কথা আছে, " Character is the crown and glory of human life " অর্থাৎ চরিত্র মানব জীবনের গৌরব ও মুকুট স্বরুপ ইংরেজীতে আরা বলা হয় " Money is lost nothing is lost, Health is lost something is lost but character is lost everything is lost. " চরিত্রের সৌন্দর্য্যেই মানুষ আলোকিত হয়ে উঠে এবং আদর্শ এবং অনুকরনীয় হিসেবে প্রতিভাত হয়।

চরিত্র বলতে একজন মানুষের আচার ব্যবহার রীতিনীতি,ন্যায়বোধ,সততা,সত্যবাদিতা, দয়া, সহমর্মিতা, দানশীলতা ইত্যাদির সমন্বিত রূপকে বুঝায়। চরিত্র প্রকাশ পায় একজন মানুষের কাজ কর্ম, আচরন, কথা এবং সভাবের মাধ্যমে চরিত্রকে মানুষের দর্পন ও বলা হয়। চরিত্র মানুষকে ইতর প্রানী থেকে উন্নততর আসন দান করে। চরিত্রবান সদাচারী মানুষ মরেও অমর হয়। তাদের আচরন,কর্ম,সেবা চিরদিন মানুষের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। চরিত্রবান ব্যাক্তি দেশ ও জাতির গৌরব এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদও বটে। আপর দিকে ঠিক তার বিপরীতে চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি দেশ ও জাতির শত্রু,সভ্যতার জন্য হুমকি। এরা নিজ স্বার্থে ব্যক্তি,সমাজ ও দেশের ক্ষতি সাধন করে। তাই এরা সবার ঘৃণার পাত্র।

চরিত্রবান ব্যক্তি যেমন একদিনে হওয়া যায় না তেমনি চরিত্রবান ব্যক্তির সামাজিক মূল্যও সবার উপরে। চরিত্র বেচা কেনার জিনিস নয়। এটি বহুদিনের সাধারন ফসল। অপ্রিয় হলেও সত্য বর্তমান সমাজ থেকে আজ চরিত্রবান ব্যক্তি প্রায় নির্বাসিত। অসৎচরিত্র ও দুর্জনদের পাল্লা সামজে আজ ভারী। আর তাই সমাজে সততা,সত্যনিষ্ট ও আন্তরিকতার বড় অভাব। তাই দেশ ও সমাজে মানুষ আজ অশান্তি আর উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত। তবে শত নিরাশার মাঝেও দু-চার জন এখনো আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন সৎ গুনাবলীর দ্বারা। এদের কল্যানে সমাজ সংসার আজও টিকে আছে। সমাজ সুন্দর করতে হলে দেশের সঠিক উন্নয়ন ঘঠাতে হলে, দেশের গণতন্ত্রকে স্থায়ী করতে হলে দেশের সার্বিক কল্যানের জন্য কিংবা ব্যক্তি জীবনে সুখ সমৃদ্ধি আনতে হলে অবশ্যই চরিত্রবান লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। কারন শক্তিশারী সমাজ প্রতিষ্ঠা কেবল এদের দ্বারাই সম্ভব।

চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তাঃ মহৎ ব্যক্তি বর্গই তাদের চরিত্রের গুনে সমাজে আজ উচুঁ আসনে অবস্থিত। মানব জীবনে চরিত্র গঠন যে কত জরুরী তা বলাই বাহুল্য। চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজ তথা দেশ ও জাতির গর্ব, সভ্যতার আশির্বাদ। পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখতে হলে মানব সভ্যতাকে সঠিক মর্যাদায় আধিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই সৎ চরিত্রবান মানুষ গড়তে হবে। যে সমাজের লোকেরা চরিত্রবান সে সমাজের অগ্রগতি অবধারিত। শত বাধাবিঘ্ন তাদের অগ্রযাত্রাকে রূদ্ধ করতে পারবে না। চরিত্র হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার। মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভের এখন উপায় হচ্ছে চরিত্রের নির্মলতা। জীবনের উন্নতির স্থলে রয়েছে চরিত্রের প্রধান ভূমিকা। রসুল (সাঃ) বলেন, "যার চরিত্র যত বেশী উন্নত সে আল্লাহর নিকট তত বেশী মর্যাদাবান এবং প্রিয়"। কজেই পার্থিব জীবনের সফলতা এবং পরকালীন জীবনের মুক্তির জন্য চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীতা অপরিসীম।

৪.২ সৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

সৎ চরিত্রবান ব্যক্তির মধ্যে যে সব গুন থাকে তাহলো সততা, নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, স্বদেশপ্রেম, ভালবাসা, স্নেহ মমতা, শ্রদ্ধাবোধ অপরের মঙ্গকামনা, বিশ্বস্ততা। লোভ, হিংসাবিদ্বেষ ও অহংকারের উর্ধ্বে উঠে মার্জিত আচরন,নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিচর্যা করে জীবন জাপন করা সৎ চরিত্রবান লোকদের বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে সততা একটি অন্যতম মহৎগুণ। কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ না করা এবং এধরনের কাজে কাউকে সহযোগীতা না করার নামই সততা। এটি একটি নৈতিক গুন এ গুনটি মানব জীবনকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। সততা মহাপাপীকেও আকর্ষন করে। যাকে যার প্রকৃষ্ঠ উদাহরন রেখে গেছেন হযরত আব্দুল কাদির জেলানী (রাঃ)। বাল্যকালে তার সত্যনিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ঠ হয়েই মহাপাপী ডাকাত সর্দার ডাকাতি ছেড়ে সৎ জীবনে ফিরে এসেছিলেন। ইসলামের কান্ডারী শান্তির বার্তা বাহক বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছোট বেলা থেকেই সত্যবাদিতার জন্য আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। আবার মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের কথাও আমরা জানি। মিথ্যা বলার কারনেই তাকে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনেই কেবল সততার পরিচর্যা আবশ্যক তা ঠিক নয়। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও সততার গুরুত্ব অপরিসীম। সততাকে জাতীয় চেতনার সাথে অঙ্গীভূত করতে পারলেই কেবল বিশ্ব সমাজে জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখা সম্ভব। জাতীয় উন্নতির মানদন্ড সততার নিরিখেই নিরুপিত হয়। পৃথিবীতে যে সব জাতি সৎ তারাই উন্নতির শীর্ষে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সততার অভাবেই মানুষ দুর্নীতি গ্রস্থ হয়ে পড়ে। এতে দেশীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়, দেশের মানুষ হয় দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। বিশ্ব সমাজে বাংলাদেশ অভাবগ্রস্ত। চরিত্রহীন ব্যাক্তির দ্বারা দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। সে যে কোন সময় যে কোন ধরনের অপরাধ করতে পারে। চরিত্রহীনের সহচার্যে নিষ্কলুষ চরিত্র ও অনেক সময় কলুষিত হতে পারে। সেজন্য বলা হয় দুর্জ্বন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য। চরিত্রহীন ব্যক্তি যেমন ইহ জীবনে ঘৃণিত হয় তেমনি পরকালীন জীবনেও সে সৃষ্টিকর্তার কৃপা থেকে হবে বঞ্চিত। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার চরিত্রকে উন্নত করে গড়ে তোলা।

৪.৩ চরিত্র গঠনে করনীয় ঃ

চরিত্র গঠনের প্রধান সোপানই হচ্ছে পরিবার। পরিবার হচ্ছে সর্ব প্রথম শিক্ষালয়। এখানেই মানুষের সমাজিকীকরনের প্রথমিক ধাপ সম্পন্ন হয়। চরিত্র গঠনের উত্তম সময় কাল হচ্ছে শৈশব কাল। জন্মের পর পরিবারের মধ্যেই শিশু বড় হয়ে উঠে। পরিবারে বসবাস কালে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সেভাবে প্রভাবিত হয়। তারা বড়দের যা করতে দেখে তাই শিখে। কাজেই শিশুর পরিবার যদি সৎ ও আদর্শবান হয় তাহলে পরিবারের শিশুটিও সৎ ও আদর্শবান হতে বাধ্য। কাজেই পরিবারের লোকজনদেরও যথা সম্ভব সৎ ও আদর্শবান হতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্তত পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণের জন্য। কারন আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ জাতীর কর্ণধার। তবে শুধু পরিবারের পক্ষে শিশুর চরিত্র গঠনে একক ভাবে অবদান রাখা সম্ভব নয়। কারন শিশুর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও স্বীকৃত। শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগড় বলা হয়। সে জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে শিক্ষকর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর মেধার পাশাপাশি চারিত্রিক দিকটাও খতিয়ে দেখা জরুরী। তারা চরিত্র গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষকে সৎচরিত্র ও আদর্শবান হওয়ার ব্যপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যাক্তি উত্তম যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। একজন ঈমানদার কখনও চরিত্রহীন হতে পারেনা। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা সচ্চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম পন্থা। ইসলাম ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মেও সৎচরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৪.৪ চরিত্রে মানবতা ও সহমর্মিতা ঃ

মানবতা ও সহমর্মিতা উত্তম চরিত্র গঠনের অন্যতম নিয়ামক। মানবতা ও সহমর্মিতাহীন মানব জীবন কেবল ঘুণে ধরা অন্তস্বারশুণ্য দেহ লালন করে। মানব কল্যাণের পরিবর্তে তখন শুধু আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনাই বিকশিত হতে থাকে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার জালে সে নিজেকে আবদ্ধ করে। অবশেষে মানুষ হয়ে পড়ে চরম স্বার্থপর। অপরপক্ষে মানবতাবোধ মানুষকে দয়ালু ও ক্ষমাশীল করে গড়ে তোলে যাতে সমাজ ও সামাজিক জীবন হয় অনেকটাই জঞ্জালমুক্ত।

৪.৫ নৈতিকতা ও নৈতিকতা শিক্ষাঃ প্রয়োজনীয়তা ও কৌশল ঃ

নৈতিকতা ঃ

নৈতিকতার ইংরেজী প্রতিশব্দ Morality বাংলা প্রতিশব্দ- সদাচরণ, শ্রেয়োনীতি, নীতিধর্ম। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নৈতিকতার সাথে চরিত্রের সামান্য পার্থক্য থাকলে ও এগুলো মানব জীবনের অত্যাবশ্যক গুণ। প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা, সৌজন্য, শিষ্টাচার আদব-কায়দা প্রভৃতি সমার্থক অর্থে প্রকাশ পায়। শিষ্ঠতা, নম্রতা, ভদ্রতা মার্জিত ও নীতিনিষ্ঠ ব্যবহারের মাঝেই নৈতিকতার সন্ধান মিলে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, নৈতিকতা অন্তরের সম্পদ তবে তা ব্যক্তির বিকাশে অমূল্য সম্পদ। সমাজবদ্ধ জীবনে নৈতিকতা একটি অপরিহার্য চারিত্রিক সম্পদ- ব্যক্তিগত ও সামাজিক ঐশ্বর্য।

নৈতিকতার শিক্ষা ঃ

নৈতিকতা ফুটে ওঠে মানুষের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। নৈতিকতা সমাজ জীবনকে উন্নত করে, পরিবেশকে সুন্দর করে। মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বাড়ায়। নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে পারলে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসবে অনাবিল শান্তির ফল্গু ধারা। তাই নৈতিকতার গুরুত্ব মানব জীবনে অপরিসীম।

নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও কৌশল ঃ

নৈতিকতার অভাবে সমাজে ভয়াবহতা নেমে আসে। নৈতিক পদস্খলনের মাধমে সকল স্তরের মানুষ ধীরে ধীরে সামাজিক সম্পর্ক হারায়। নৈতিকতা না থাকলে সমাজ জীবনে বৈষম্য বেড়ে যায়। চক্ষু লজ্জা থাকেনা। ফলে চরমে ওঠে মিথ্যাচার, শঠতা, ধাপ্পা ও ধান্দাবাজি। ভোগবিলাস ও অর্থলিপ্সা হয় বেপরোয়া।
নৈতিকতার অভাবে হৈ হুল্লোড়, ভাংচুর, চুরি, ডাকাতি, নেশাভাং, বোমাবাজি, শিশু-নর নারী হত্যা ঘটে চলেছে নিরন্তর। এসবের হাত থেকে মুক্তির উপায় নৈতিক জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তোলা।

অধ্যায়-৫
ধর্মীয় ও পারিবারিক/সামাজিক মূল্যবোধ

৫.১ ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষা ঃ

ভূমিকাঃ জন্মগত ভাবে মানুষ পরিবার ভূক্ত। পরিবারে মানুষ জন্ম গ্রহন করে এবং পরিবারেই বড় হয়। পারিবারিক আদর্শেই মানুষের জীবন গড়ে উঠে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার লালন-পালন, শিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি পরিবারেই সমাপ্ত হয়। তাই পরিবার একটি আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর সাহায্য ব্যতীত মানুষ কিছুতেই সুখী-সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারেনা। সুতরাং জীবন উৎকর্ষের মূল কাঠামো ও উপাদন হলো পরিবার।

পরিবারের সংঙ্গাঃ

পরিবার বাংলা শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ হলো আইলাতুন,আশীবাতুন, উসরামুন এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ Family শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ হতে যার অর্থ পিতামাতা সন্তান-সন্ততি, চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসী নিয়ে একটি সংসার।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়-পবিার হচ্ছে জৈবিক চাহিদা পূরন, সন্তান জন্মদান এবং লালন পালনের নিমিত্ত বৈধ বিবাহের মাধ্যমে গঠিত একটি সমাজ স্বীকৃত ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে পরিবারঃ-

১. প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, "যৌনসম্মতির মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানই হলো পরিবার।"
২. সামাজ বিজ্ঞানী অগবানের মতে "সন্তান মন্ততি সহ বা সন্তান-সন্ততি বিহীন দম্পতি দ্বারা সৃষ্ঠ সংঘকে পরিবার বলে।"
৩. সমাজ বিজ্ঞানী এফ্ নিম্বাক "Nlariege and The Family" গ্রন্থে বলেছেন " পরিবার হলো স্বামী স্ত্রীর একটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠান। সন্তান-সন্ততি তার অঙ্গ হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার বলতে বুঝায় এমন একটা ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যেখানে বৈবাহিক ও রক্ত সম্পর্কীয় সূত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের পরিজন সহ বসবাস করে।

ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষাঃ- পরিবারহীন মানুষ নোঙ্গরহীন নৌকা বা বৃন্তচ্যুত পত্রের মতই স্থিতিহীন। মূলত পরিবারকে কেন্দ্র একটি মানুষের সামগ্রীক জীবন আবর্তিত হয় তাই পরিবার হচ্ছে এক স্থায়ী ও অক্ষয় মানবীয় সংস্থা। ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষা নিম্নরুপঃ

১. **মানব বংশ সংরক্ষণঃ**- আলাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীর খলীফা বানিয়েছেন। তিনি তাদের স্বাভাবিক জন্ম ধারা ও বংশ বিস্তার অব্যাহত রাখতে চান। রাসুল (সঃ) বলেন, "তোমরা বিয়ে কর এবং বংশ বৃদ্ধি কর।" হযরত ঈসা (রাঃ) ব্যতীত সকল নবী পরিবার ব্যবস্থাধীন জীবনযাপন করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষনা "আমি তোমার পূর্বে রাসুল গণকে প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে সন্তান সন্ততি দান করেছি। (সুরা-আররাদ-৩৮)
২. **কর্মের প্রতি স্পৃহা ও উদ্যম লাভঃ**- আলাহর খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রথিবীতে মানুষের আগমন ঘটেছিল। এ উদ্দেশ্যে প্রতিটি মানুষকে একটানা দৈহিক অথবা মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। এতে দেহে নেমে আসে ক্লান্ত এবং কর্ম-স্পৃহা স্তিমিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় পরিবার বর্গের সাথে মিলিত হলে সৃষ্টি হয় নবোদ্যম এবং মানুষ কর্ম-স্পৃহায় সঞ্জীবীত হয়ে উঠে। ইমাম গাঞ্জালী (রাঃ) এর বর্ণনামতে মহানবী (সঃ) যখন নবয়তের গুরুভার বহনে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন হজরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট এসে বলতেন "হে আয়শা আমার সাথে কথাবল।"
৩. **চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষাঃ**- সকল সৎকর্মের উৎস হচ্ছে সচ্চরিত্র। প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন "সচ্চরিত্র হচ্ছে পূর্ণ চারিত্রিক অধঃপতন জনিত অপরাধের চেয়ে মানব সমাজের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকরী আর কিছু নেই। তজ্জন্য এটা বোধের ব্যবস্থা হিসেবে পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করবার বিধান ইসলামী জীবন

ব্যবস্থায় রয়েছে। পরিবারের সদস্যগণ পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে যাতে কেউ দুশ্‌টরিত্র হতে না পারে। আধুনিক সমাজ তত্ত্বাবদ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে এটা অভিজাত সত্য যে, বর্তমান সমাজ তরুণদের মধ্যে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধির মূলে রয়েছে পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা।

৪. **সুখ ও শান্তিময় জীবনযাপনঃ-** আলাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসা নামক যে সকল গুনাবলীদান করেছেন, তার সঠিক প্রয়োগ ও বিকাশ একমাত্র পারিবারিক জীবন ব্যবস্থায় সম্ভব। পবিত্র কুরআনের ঘোষনা "তার নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটাও যে, তিনি তোমদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও সহৃদয়তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (রুম-২১)

৫. **মানব শিশুর বিকাশ সাধনঃ-** মানব জাতির শৈশবকালে তার পুরো জীবনের অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন। এ সময় তাব মাধ্য যথাযথ মানবতার বিকাশ না ঘটলে তার পক্ষে প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব হবে না। সেজন্য পরিবারের প্রবন উদ্দেশ্য হলো শিশুর বিকাশ সাধন।

৬. **সদস্যদের নিরাপত্তা লাভঃ-** পরিবার ব্যবস্থা এর সকল সদস্যদের নিরাপত্তা প্রদান করে াকে। পারিবারের কোন সদস্য যদি বার্ধক্য জনিত দুর্বলতার কারনে কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অথবা অসুস্থতার কারনে সাময়িক ভাবে নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় কিংবা কোন সদস্য যদি বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে সে নিজকে নিরাশ্রয় ও আসহায় মনে করে না। কেননা এরূপ পরিস্থিতে পরিবারের অপরাপর সদস্যগন তার ভরনপোষন, চিকিৎসা এবং সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়। কুরআনের ঘোষনা "তুমি তোমার আত্নীয় নিসকীন ও পাথিকদের হক আদায় কর। (বনীইসঃ২৬)

৭. **পারস্পরিক প্রয়োজনঃ** সম্মিলিত ভাবে বসবাস করে পারস্পরিক প্রয়োজন ও অভাব পূরন করা।

৮. **জৈবিক চাহিদাঃ-** মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরনের হলে...

৯. **প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানেঃ-** শিষ্টাচার ও আদবকায়দা শেখানো, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্বশীলতা ও সহযোগীতায় ধারা চালু করা।

১০. **বৈষয়িক শিক্ষাঃ-** দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বৈষয়িক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব অক্ষুন্ন ব্যখ্যাঃ-** পরস্পরের প্রতি মহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন করা। ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি সম আবরনের মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব অক্ষুন্ন রাখা।

৫.২ পরিবারের প্রতি কর্তব্য পরিকল্পিত পরিবার ঃ

পবিত্র ও উন্নত মানব প্রজন্মের ধারা অব্যাহত রাখতে পরিবারের কোন বিকল্প নেই। পরিবার মানব জীবনকে এ জগৎ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও অনাবিল আনন্দ দানে সহায়তা করে সন্তান-সন্ততি লালন-পালন, সন্তানের সুশিক্ষা পরিবারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য ও পরিকল্পিত পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ-

১. **বৈধ দাম্পত্য জীবনযাপনঃ-** মানব বংশধারা অব্যাহত রাখা এবং সুখ-শান্তিময় জীবন-যাপনের জন্য মানব-মানবীকে বৈধ ও অনু-মোদিত দাম্পত্য জীবন যাপন করা অপরিহার্য, আর পরিবার প্রবর্তিত এ কাজটি প্রথম করে থাকে। নরনারীর অবৈধ সম্পর্কের কারনে যে সন্তান জন্ম গ্রহন করে তা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত নয় এবং জারজ সন্তান হিসেবে সমাজে ঘৃনিত হয়। আর তা মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্য মারত্মক পরিনতি ডেকে আনে। এ জন্য প্রতিটি ধর্ম বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন শুরু করতে বলেছে। আধুনিক কিছু সংখ্যক পরিবার সন্তান জন্ম দানের কাজে নির্দিষ্ট কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে কম সন্তান জন্মদানের আশায়। সচেতন ও শিক্ষিত পরিবার জনসংখ্যা শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সচেষ্ঠ হচ্ছে। তবুও আধুনিক সমাজে সন্তান জন্ম দানের জৈবিক কাজটিকে একবারে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। সামজের মূল্যবোধ পরিবর্তনে যতই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক না কেন স্বামী স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক বজায় রাখা পরিমারের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি।

২. <u>সন্তান লালন পালন ও পরিচর্যাঃ-</u> শিশুর প্রতি পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের আদর, স্নেহ,ভালবাসা ইত্যাদী যতটা জৈবিক কাজ তার চেয়ে বেশী মনস্তাত্বিক। শিশুর লালন-পালনের দায় দায়িত্বের ভিত্তি হলো শিশুর প্রতি মমতাবোধ। শিশুর পরিচর্যা,চিত্তবিনোদন,ব্যায়াম,আদর এবং সর্বপরি তাকে স্নেহের পরশে লালন-পালনের কাজটি পারিবার করে থাকে। আধুনিক কালের অধিকাংশ সামাজিক মনোবিজ্ঞানই এ কথা স্বীকার করেন যে, ব্যাক্তিত্ব গঠনে শিশুর পারিবারিক অভিজ্ঞতা সুদুর প্রবাসী ভূমিকা রাখে। শিশু কিশোরেরা অতিশয় আবেগ প্রবন হয়। জগতের নানা রহস্য সম্পর্কে তাদের অনেক প্রশ্ন। তারা ক্ষেত্র বিশেষে স্পর্শকাতর হয়। তাই শিশুকে আদর-স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন ও পরিচর্যা করা পরিবারের কাজ।

৩. <u>পরিবার সদস্যদের প্রশিক্ষনালয় হিসেবে গড়ে তোলাঃ-</u> ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থায় এর সদস্যদের বিশেষ করে সন্তান-সন্ততিদেরকে শৈশব হতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রশিক্ষণ ও তা জীবনে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করাও পরিবারিক শর্তাবলীর অন্যতম কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন" আর তোমার পরিবারবর্গ ও সন্ত ান-সন্ততিদের সালাত আদায় করার জন্য আদেশ কর এবং তা নীতিমত আদায় করায় তাদের অভ্যস্ত করে তোলে" (আত-ত্ব-হাঃ১৩২)

৪. <u>মানবিক গুনাবলীর লালন কেন্দ্রঃ-</u> ধর্মীয় পারিবারিক ব্যবস্থা মানবিক গুনাবলীর লালন ভূমি। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি,মায়ামমতা,আদর-স্নেহ,সমবেনাতা,ওদারাতা,মাহয়েতা,মহানুভূতি,শ্রদ্ধা ভালবাসা, আদব কায়দা সাহায্য সহযোগীতা,কর্তব্য-দায়িত্ব বোধ,তাহযীব,তামাদ্দুন ইত্যাদী মানবিক গুনাবলীর উন্মেষ ঘঠানো অপরিহার্য।

৫. <u>মানব সভ্যতার লালন ক্ষেত্রঃ-</u> (ইসলামী) ধর্মীয় পরিবার মানব সভ্যতার লালন ভূমি হিসেবে গড়ে তোলা প্রতিটি পরিবার প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রী প্রীতিমায় পূর্ত পবিত্র পারিবারিক পারিমন্ডলে শিশুর জন্ম হয়। পিতা-মাতা,আত্মীয়-স্বজনের হৃদয় নিংড়ানো আদর স্নেহ,মায়া-মমতার লারিত পালিত হয়ে বড় হয়। আদর কায়দা-স্নেহ,মায়া-মমতায় লালিত পালিত হয়ে বড় হয়। আদব কায়দা শেখে। উন্নত শিক্ষাদীক্ষায় গড়ে ওঠে। ভিত্তি ভালহলে তার জীবন ও সুন্দর হয় উন্নত দেশ গুলোতে পারিবারিক বন্ধন নেই বলে সেখান অবস্থা আজ বড়ই হতাশা ব্যক্তক।

৬. <u>আর্থ সামজিক নিরাপত্তা বিধানঃ-</u> পরিবারের সদস্যদের আর্থ সামজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পরিবার প্রধানদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কাজ। বিপদে-আপদে, অক্ষমতায় কোন সদস্যই অসহায় বোধ যাতে না করে যেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা পরিবারের কাজ। সকল অবস্থায় পরিবারের সদস্যগণ একে অপরের সুখ-দুঃখ এগিয়ে আসে। তার ভরন-পোষন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। পরিবারে বাচ্চারা শুধু সহানুভূতিই পায়না ইসলামী পরিবার তারা সম্মানের পাত্র।

৭. <u>প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ধর্মীয় শিক্ষাদান কাজঃ-</u> পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামজিক মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। বস্তুত ধর্ম মানুষকে নীতিবান,সৎ ও সততা সন্ধানী করে তোলে। ধর্ম ব্যক্তিগত লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রন করে এবং চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৮. <u>সামাজিক কাজঃ</u> পরিবারের অন্যতম গুরুত্ব কাজ হলো সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত সামজিক জীব হিসেবে গড়েতোলা। প্রাথমিক ভাবেই এ কাজটি পরিবারের উপরই বর্তায়। পরিবারই তার শিশু কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ,আচার প্রথা রীতিনীতি তথা সামাজিক ধ্যান ধারনা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান সরবরাহ করে।

৯. <u>চিত্ত বিনোদন বা শরীর চর্চার ব্যবস্থাকরাঃ-</u> সাধারনত চিত্ত বিনোদনের অন্যতম প্রানকেন্দ্র গুলো পরিবার। পরিবারের মাধ্যমে নানাবিধ শরীরচর্চা মূলক খেলাধুলা ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদ করে তাদের এক ঘেয়োমি দূর করার চেষ্টা করে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, পরিবারের এসব কার্যাবলী সুশৃংখল পরিবার বিন্দু মাত্র কমেনি বরং বেড়েছে।

৫.৩ সামাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

দায়িত্ব ও কর্তব্য শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক দায়িত্ব শব্দের অর্থ যা অবশ্যই পালন করতে হয় আর কর্তব্য অর্থ করনীয়। যার উপর যে কাজের দায়িত্ব ভার থাকে তা পালন করা হচ্ছে দায়িত্ব। আর যাবতীয় অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার নামই হলো কর্তব্য পরায়নতা। আবার সাধারনত যখন কাউকে কোন কাজের হুকম করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তিনি ঐ কাজ পালনে প্রস্তুত হন তখন তার উপর অর্পিত কার্যাবলীকে দায়িত্ব বলে। সামাজিক জীবন একজন মানুষ হিসেবে অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মানুষের ব্যাক্তিগত জীবন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেই মহানবী (সঃ) বলেছেন "সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

১. **ব্যাক্তিগত জীবনেঃ-** একজন মানুষ হিসেবে সর্ব প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো নিজেকে গঠন করার, লেখা-পড়া শিখিয়ে জ্ঞান অর্জন করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। কেননা নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে না পারলে অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা যায় না। নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে মহানবী (সঃ) বলেছেন তোমার নিজের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে।"

২. **সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রেঃ-** সন্তান-সন্ততিকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পিতামাতার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদেরকে লালন থেকে শুরু করে সুশিক্ষা দানে, সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সততা, ভদ্রতা, নমতা, একতা, উদারতা, সহনশীলতা,সহিষ্ণুতা, সহানুভূতিশীলতা ইত্যাদি সদগুনের শিক্ষা দিতে হবে।

৩. **পিতামাতার ক্ষেত্রেঃ** সৃষ্টি জগতে মানব সন্তানের প্রতি সর্বাধিক অনূগ্রহ প্রদর্শনকারী হচ্ছে পিতামাত। তাই পিতামাতাই তার সর্বাপেক্ষা আপনজন। আর সন্তানের নিকট পিতামাতার প্রাপ্যই সর্ববৃহৎ প্রাপ্য। পিতামাতার প্রতি সন্তনের দায়িত্বও সর্বাধিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "পিতামাতার প্রতি উত্তম আচরন কর" (সুরানাস-৩৬)

৪. **স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেঃ-** বিদায় হজ্জের ভাষনে মহানবী (সঃ) বলেন "নারীদের উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার রয়েছে, পুরুষের উপর নারীদেরও সেরূপ অধিকার রয়েছে।" এখানে নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী তেমনি ভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে যা প্রদান করা অপরিহার্য। স্বামী-স্ত্রী একটি পাখিতুল্য। অর্থাৎ একটি পাখির যেমন দুটি ডানা স্বামী-স্ত্রীরও সে রকম একটি পাখির দুটি ডানার ন্যায়। এ প্রসঙ্গে আলাহ তায়ালা ইরাশাদ করেন " তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক।" (সুরা বাকারাহ ১৮৭)

৫. **বড়দের ক্ষেত্রেঃ-** বড়দের যেমন ছোটদের প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, ছোটদেরও প্রতি তেমন বড়দের প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং বড়দের প্রতি ছোটদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করা উচিৎ। প্রচলিত একটি কথা আছে " বুদ্ধি বাড়ে বয়সের গুনে" তাই বড়দেরকে সর্বসময় শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যে সমাজে বড়দের সম্মান করা হয় না সে সমাজের ধংস অবশ্যম্ভাবী। মাহানবী (সঃ) বলেছেন "আলাহ তায়ালা অন্যের দ্বারা তাকে সম্মান করাবেন।"

৬. **ছোটদের ক্ষেত্রেঃ-** বড়দের উচিৎ ছোটদের প্রতি আদর,স্নেহ,মায়া,মমতা প্রদর্শন করা এবং দায়িত্ব কর্তব্য সুচারু রূপে পালন করা। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) বলেন "যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করেনা সে আমাদের দল ভূক্ত নয়।" ছোটদেরকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব বড়দেরই।

৭. **আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেঃ-** আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্মান বজায় রাখা প্রত্যেকের মানবিক দায়িত্ব। বিপদাপদে তাদের পাশে দাড়ানো এবং তাদের সাহায্য সহযোগীতা করা আবশ্যক। কখনই তাদের সাথে

মনোমালিন্য সৃষ্টি করা উচিৎ নয়। এ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেন "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

৮. <u>প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেঃ</u> ইসলামী দৃষ্টি কোন থেকে বাড়ীর চার পাশের ৪০ (চল্লিশ) বাড়ী পর্যন্ত বসবাসকারীদেরকে প্রতিবেশী বলা হয়। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরন,খোজ খবর নেওয়া, বিপদে পাশে দাড়ানো, অসুস্থ হলে সেবা করা ইত্যাদি প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মহানবী (সঃ) বলেন সে ব্যক্তি মমিন নয় যে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপন করে।"

৯. <u>স্বদেশের সেবায়ঃ</u> প্রত্যেক মানুষের স্বদেশের প্রতি ভালবাসা এবং স্বদেশকে সেবা করা উচিৎ। যারা মূলতঃ স্বদেশকে ভালবাসেনা তার সুনাগরিক নয় তারা ভীতু, কাপুরুষ। কেননা দেশ প্রেম ঈমানের অংশ। মহানবী বলেছেন "স্বদেশ প্রেম ঈমানের অংশ।"

১০. <u>দুস্থ মানুষের সেবায়ঃ</u> আল্লাহ তায়ালার এ সৃষ্টিশীল অসংখ্য মানুষ দুস্থঃ,অসহায়,নিরন্ন এবং কপর্দকশুন্য। তাদের সাহায্য সহযোগীতা ও সেবা করা মানুষের ইমানী দায়িত্ব। কেননা আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোন সময় সামর্থবানকে অসহায় করতে পারেন। আবার ধনীকে গরীব করতে পারেন। এটি তার ইচ্ছা। এজন্য দুঃস্থদের সেবা করা উচিৎ।

১১. <u>সৃষ্টির সেবায়ঃ-</u> জগতের সবকিছু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্য। এরা প্রত্যেকেই আমাদের কোন না কোনভাবে উপকার করছে। তাই এসব মানুষের প্রতি সদয় হওয়া উচিৎ। তবে যে গুলো মানুষের ক্ষতি করবে সে গুলোকেও ধ্বংস করারও বিধান রয়েছে। অনেক প্রাণী বাহ্যিক ক্ষতি করলেও এরা মানুষের অনেক উপকারও করে থাকে। যেমন সাপকে ক্ষতিকর প্রাণী হিসেবে আমারা জানি। অথচ এ সাপের বিষ থেকে উন্নত মানের ঔষধ তৈরী করা হচ্ছে। যা মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, তাই অন্যান্য জীব যেমন- পশুপাখি, গাছপালা প্রভৃতির প্রতিও মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। সৃষ্টির প্রতি অবহেলা করলে সৃষ্টিকর্তা বিরূপ হন।

<u>উপসংহারঃ-</u> উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কতর্ব্য রয়েছে তা যদি যথাযথ ভাবে পালন করা যায় তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন সাবলীল ও সুন্দর হবে এবং সমাজ দ্রুত উন্নতির শিখায় পৌছাবে। তাই মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা যথাযথ ভাবে পালনে আন্তরিক হওয়া উচিৎ।

৫.৪ ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যাবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন ঃ

কথিক আছে যে , ধর্মহীন জীবন পশুর জীবন। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে তাকে সত্যিকারের মানুষ বলা যায় না। ধর্ম মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ নিয়ন্ত্রন করে। মহান স্রষ্টা প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুকে বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনই ধর্ম। কোন একটি ইঞ্জিন যেমন নির্ধারিত ফর্মূলা মত না চালালে বিশৃংখলা দেখা দেয় তেমনি মহান আল্লাহ্তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তার জীবন পরিচালনার বিস্তারিত ফর্মূলা দিয়েছেন। এই ফর্মূলা মোতাবেক জীবন পরিচালনা না করলে বিশৃখলা ও অশান্তি দেখা দেয়।

আল্লাহ্ বলেন " অতএব যে আমার প্রদত্ত্ব হেদায়ত অনুস্বরণ করে চলবে তার ভয় ও চিন্তা থাকবে না।" ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সুস্পষ্ট হিদায়ত বা পথ নিদের্শ রয়েছে। এসব হেদায়ত মেনে চললে মানব জীবন শান্তি ও কল্যাণে ভরে উঠবে। এর ব্যত্যয় ঘটালে দেখা দিবে মহাবিপর্যয়, অশান্তি ও বিশৃংখলা। জীবন বিস্ময়কর হয়ে উঠবে।

সুষ্ঠ, সুন্দর, সুখী সমৃদ্ধশালী আদর্শ জাতি সমাজ গঠনে মুসলিম পারিবারিক জীবনের অন্যমত উদ্দেশ্য । সুষ্ঠ জাতি গঠনের জন্য সুষ্ঠ পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সুতরাং পারিবারিক জীবন গঠন হল ইসলামী সমাজের রক্ষাদূর্গ।

আল্লাহ মানব জাতিকে তারই দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর আল্লাহর বিধান পালন শুরু হয় পারিবারিক জীবন থেকে।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন- "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি বানাব ।"

সুতারাং আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করতে হলে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তার বিধান মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

এ বিশাল সংসারে ক্ষুদ্রায়তন পরিবারই একটি মানুষের আশ্রয় মূল। সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আহার-বিহার, নিদ্রা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি পারিবারিক পরিমন্ডলেই অন্তরভুক্ত হয় বেশী। তাই নিবিড় আশ্রয়ের জন্য মানুষকে পরিবার গঠন করতে হয়। মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরু, খাওয়া-পরা, সাহায্য-সহানুভুতি, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন প্রভৃতি দায় দায়িত্ব সমন্ধে পারিবারিক ভাবে প্রতিপালন হয়ে থাকে । একজন অক্ষম হলে অন্য জন তা আন্তরিক ভাবে পালন করে। পরিবার একটি দেহের ন্যায় আর সদস্যরা এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

ইসলামী দাম্পত্য জীবন নারী পুরুষকে কু-প্রবৃত্তি, উচ্ছৃংখলতা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপমুক্ত জীবনের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, " তারা(স্ত্রীগণ) তোমাদের ভূষণ এবং তোমারা তাদের ভূষণ"।

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ আবর্তনশীল। তাই তার প্রয়োজন স্থায়ী সঙ্গী সাথী ও অকৃত্রিম বন্ধুর। এ প্রয়োজন পুরণের উদ্দেশ্যে মানুষ স্থায়ী সম্পর্ক ও নিবিড় বন্ধন স্থাপনের জন্য ঘর বাঁধে, পরিবার গঠন করে।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ, সমঝোতা, উদারতা, সহায়তা, সহনশীলতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আদব-কায়দা, কর্তব্যও দায়িত্ববোধ তাহযীব ও তমুদ্দন ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে। এগুলো বৃহত্তর সমাজ সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখে এবং সুষ্ঠ সমাজ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ইসলামী পরিবারে লজ্জাহীনতা, দায়িত্বহীনতা এবং উচ্ছৃংখলতার কোন স্থান নেই। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সমঝোতা, সহযোগিতা, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি গুণাবলী আদর্শ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। আর এই সবগুণের অনুশীলন ও পরিচর্যা পরিবারেই হয়ে থাকে। সুতারাং ইসলামী সমাজ গঠনে ইসলামী পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও গ্যারান্টি রয়েছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়। কেননা ইসলাম এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে সুখ, শান্তি , কল্যাণ এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার পুরণের নিশ্চয়তা দেয়। একটা সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়তে হলে চাই সু-নাগরিক । সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক যদি পারস্পারিক শ্রদ্ধা, ভালবাসাও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান করে, তাহলে সে সমাজে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ পরিহার করে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে হবে। সমাজ দেহকে সুষ্ঠ ও সুন্দর রাখার জন্য সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে চলার কোন সুয়োগ ইসলামী সমাজে নেই। রাসূলপাক (সাঃ) বলেছেন- "তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

ইসলাম সমাজের প্রত্যেক নাগরিককে সকল প্রকার অন্যায় ও ক্ষতির কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়। নিজের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিংবা নিজের চিত্ত বিনোদনের জন্য এমন কাজ করা যাবে না । যা দ্বারা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) বলেন- " তুমি ততক্ষন পর্যন্ত মমিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তোমার দু হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়। "

একজন মানুষ যখন মনে করে যে, আমি যা করছি তা দুনিয়ার কেউ না দেখলেও আল্লাহ্তায়ালা দেখছেন এবং তারই কাছে জবাব দিহিতা করতে হবে। তখন আর সে যে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। এমনিভাবে পরিবার ও সমাজের প্রতি যদি যথাযথ মূল্যেবোধ জাগ্রত করা যা, তখন তার থেকে যাবতীয় অন্যায় ও ক্ষতিকর কর্ম হতে পরিবার ও সমাজ নিরাপদ হয়। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও পারস্পারিক শ্রাদ্ধাবোধ তখন স্থান করে নেয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুখ শান্তিতে ভরে উঠে।

অধ্যায়-০৬
দুর্নীতি ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয়তা

বিষয়বস্তু ঃ "দুর্নীতি ও দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা।"

৬.১ "দুর্নীতির সংজ্ঞা ও দুর্নীতির ক্ষেত্র"

ভূমিকাঃ যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্নীতি আজ অন্যতম প্রধান সামাজিক ব্যাধি হিসাবে সার্বজনিনভাবে প্রতিষ্ঠিত। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির অবস্থান ও সক্রিয়তা নিয়ে আজ আর কোন বিতর্ক নেই; যদিও সমাজ ভেদে দুর্নীতির কার্যকারিতা ও মাত্রায় তারতম্য রয়েছে।সমাজ জীবনে দুর্নীতির অবস্থান স্মরণাতীতকাল থেকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "Corruption in Ancient India" গ্রন্থে বলেছেন- "আমরা পছন্দ করি বা না করি দুর্নীতি ছিল আছে এবং থাকবে।"

দুর্নীতির সংজ্ঞাঃ দুর্নীতি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Corruptus শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন। সাধারণভাবে আমরা বুঝি নীতি বহির্ভূত কোন কার্যকলাপকে দুর্নীতি বলে। জাতিসংঘ প্রণীত ম্যানুয়াল অন এ্যান্টিকরাপশন পলিসি (Manual on Anti- corruption policy)- তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা অপব্যবহার করাই হচ্ছে দুর্নীতি।

সমাজ ও ধর্মের বিধিনিষেধ বা রীতিনীতি দ্বারা মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারণকে বলে দুর্নীতি। দুর্নীতির গতি প্রকৃতি বহুমুখী ও বিচিত্র ধরণের বিধায় এর সংজ্ঞা নিরুপণ জটিল। বাংলাদেশ দুর্নীত দমন কমিশন আইন অনুযায়ী দূর্নীতি বলতে ঘুষ, লেনদেন, সরকারি কার্মচারী কর্তৃক পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শন, আইন পরিপন্থী কর্ম, হিসেব-নথি-দলিল ইত্যাদিতে অসাধু উপায় অবলম্বন প্রভৃতিকে বুঝায়। মোট কথা পেশা, ক্ষমতা, সুযোগ সবিধা, পদবী ও প্রভৃতির অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি বা মহল বিশেষের অসুভ বা অন্যায় স্বার্থ হাছিল করাই দুর্নীতি।

দুর্নীতির ক্ষেত্রঃ দুর্নীতি ক্ষেত্র বলতে সাধরণভাবে আমরা বুঝি কোন্ কো্ খাতে বা কোন কোন কর্মকান্ডে দুর্নীতি হয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে সমাজের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতি হয় না। সমাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে দুর্নীতি সংক্রামক ব্যধির মত ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য ক্ষেত্র নিম্নরূপ

প্রশাসনিক ক্ষেত্রঃ বর্তমানে বাংলাদেশের কোন সরকারি দপ্তর বিভাগই দুর্নীতি মুক্ত নয়। ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, অপচয় ও চুরি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি হয়। বাইবেলের ২৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে- "তোমরা ঘুষ গ্রহণ করবে না, ঘুষের রসরসে মিষ্টতা অন্ধকারে পর্যবসিত হয়।"

রাজনৈতিক ক্ষেত্রঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে দুর্নীতি হচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বরখেলাপ, ক্ষমতায় থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে সুযোগ সুবিধা অন্যায়ভাবে নিজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রঃ ব্যবসায়ী মহল কর্তৃক মজুদদারীর মাধ্যমে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা, কর, শুল্ক, খাজনা ইত্যাদি ফাঁকি দেয়াসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দুর্নীতি গ্রাস করে ফেলেছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রঃ পরীক্ষায় ব্যাপক নকল প্রবণতা, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে অর্থ আদায়, ক্লাশে ভালভাবে না পড়িয়ে প্রাইভেট টিউশানি, নিয়মিত ক্লাশে না আসা- শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত করছে।

সরকারী সেবা সংস্থার দুর্নীতিঃ সরকারী সেবা সংস্থাগুলোও দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক ভাবে। ঘুষ ছাড়া কোন কাজই করা যায়না।

বেসরকারী খাতঃ বেসরকারী খাতে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার নামে সরকারী সুবিধা ও ব্যাংক ঋণ নিয়ে সে অর্থ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কর ও শুল্ক ফাকি, শেয়ার মার্কেট ক্যালেংকারী ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

৬.২ "দুর্নীতির কারণসমুহ" ঃ

দুর্নীতির কারণগুলোকে সাধারণত ৩টি ভাগেভাগ করা যায়। যথাঃ (১) আইনগত, (২) প্রশাসনিক কারণ ও (৩) আর্থ-সামাজিক কারণ।

(১) আইনগত কারণঃ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলোর অকার্যকারিতার জন্য অর্থাৎ প্রশাসন বিভাগ ও সংসদের প্রভাব থেকে বিচার বিভাগ সম্পূর্ন স্বাধীন না হওয়ায় দুর্নীতি গ্রস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির বিধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে দুর্নীতি গ্রস্তরা তাদের প্রাপ্ত শাস্তি থেকে বেচে যায়। একারণে দুর্নীতি কেবল অব্যাহতই থাকে না বরং বিস্তার লাভ করে। দুর্নীতি দমন কমিশনও শাসন বিভাগের প্রভাব মুক্ত নয়। তাই এ প্রতিষ্ঠানটিও দুর্নীতি দমনে তেমন সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য বর্তমানে বিষয়টি সংস্কারের ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন বহুলাংশে কার্যকর ভুমিকা পালন করছে।

(২) প্রশাসনিক কারণঃ দুর্নীতির জন্য কতিপয় প্রশাসনিক কারণ রয়েছে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) রাজনৈতিক প্রভাবঃ প্রশাসনে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ স্বার্থে রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষী হন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দুর্নীতি গ্রস্থ। এর প্রভাবে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

(খ) স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতার অভাবঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি বিস্তারের একটি অন্যতম কারণ হলো প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব।

(গ) দায়িত্বে অবহেলাঃ নির্দিষ্ট দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে অবহেলাও দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

(ঘ) তথ্যে অধিকারের অভাবঃ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের তথ্য লাভে সাধারণ সার্বজনীন অধিকার না থাকায় দুর্নীতির পরিমাণ বেড়ে যায়।

(৩) আর্থ-সামাজিক কারণঃ দুর্নীতির জন্য নিম্ন লিখিত আর্থ-সামাজিক কারণগুলো অন্যতমঃ

(ক) ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতাঃ চলমান সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে ভোগবাদী প্রবণতা অর্থাৎ ভোগের লিপ্সা নিরন্তর বাড়ছে। ফলে মানুষের লোভ লালসা ক্রমাগত বাড়ছে। এই লোভ লালসা চরিতার্থ করতে ক্ষমতাবানরা সমাজ ও জাতির স্বার্থ উপেক্ষা করে নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করেত দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে।

(খ) নৈতিক মূল্যেবোধের অবক্ষয়ঃ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে নৈতিক মূল্যেবোধের অবক্ষয় বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

(গ) আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতাঃ দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে জনসাধারণের বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট আয় দ্বারা যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। ফলে আয়-ব্যয়ের অসাঞ্জস্যতার কারণে দুনীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঘ) ধর্মীয় মূল্যেবোধের অভাবঃ প্রত্যেক ধর্মেরই মূলমন্ত্র মানব সেবা অর্থাৎ নিজ স্বার্থের পরিবর্তে অন্যের স্বার্থ দেখা। আর এই ধর্মীয় মূল্যেবোধ না থাকায় অন্যের স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ উপেক্ষা করে মানুষ নিজ নিজ স্বার্থে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজ তথা রাষ্ট্রে দুর্নীতির পরিমানবৃদ্ধি পায়।

(ঙ) ক্রমবর্ধমান বেকারত্বঃ বেকার সমস্যার কারণেও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির নিমিত্তে একটা চাকুরীর জন্য ভিটামাটি বিক্রি করে ঘুষ প্রদান করে। আবার চাকুরীকালীন সময়ে সে সুযোগ বুঝে ঘুষ গ্রহণ করে। এভাবে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(চ) অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাঃ বাংলাদেশে অর্থের মাপকাঠিতে সামাজিক মান-মর্যাদা পরিমাপ করা হয়। সৎ পথে অর্জিত সামান্য অর্থ দ্বারা সামাজিক মান-মর্যাদা অর্জন করা যায়না। ফলে অনেকেই অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে সামাজিক মান-মর্যাদা লাভের চেষ্টা করে, যা সামাজিক দূর্নীতি বৃদ্ধি করে।

(ছ) শাস্তির অপ্রতুলতাঃ অপরাধের ধরণ/মাত্রানুসারে শাস্তির মাত্রা/পরিমাণ কম হলে দুর্নীতি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(জ) আর্থিক অস্বচ্ছলতাঃ আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ সমাজে সৎ উপায়ে মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। এতে সমাজ দুর্নীতির প্রসার ঘটে।

(ঝ) রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য নির্বাচনে বিপুল পরিমান অর্থ অবৈধভাবে ব্যয় করে ভোটারদের প্রভাবিত করে নির্বাচিত হয়ে পরবর্তীতে দুর্নীতি মাধ্যমে সুদ-আসলে সে টাকা হস্তগত করতে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ।

(ঞ) উচ্চাভিলাষী মোহঃ রাতারাতি আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠালাভের তীব্র আকাঙক্ষা এদেশে দুর্নীতি বিকাশের অন্যতম কারণ।

৬.৩ দুর্নীতির কারণে সমাজ ও দেশের ক্ষতিসমুহ ঃ

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দুর্নীতি বিভিন্নভাবে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে সমাজ ও দেশের ক্ষতির প্রভাব নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(১)অর্থনৈতিক প্রভাবঃ দুর্নীতির ফলে জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়ে। উন্নয়ন কার্যকম ব্যাহত হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়। কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের অডিটর জেনারেলের অডিট রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, গত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সেবা খাতে দুর্নীতি কারণে রাষ্ট্র প্রতি বছর প্রায় ৮-১০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দুর্নীতির কারণে সমাজের নিম্ন আয়ের লোকদের আয় কমে যায়, অপরদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নিম্ন আয়ের লোকদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। পরিনামে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ন্যায় বিচর ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়াও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। একটা জড়িপে দেখা গেছে বাংলাদেশে ৯টি খাতে ২৫টি সেবা নিতে প্রায় ৭৪% শতাংশ লোক ঘুষ দেয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসেব মতে বাংলাদেশে অবৈধ আয়ের পরিমান মোট জাতীয় আয়ের ৩০-৩৪ শতাংশ।

(২) রাজনৈতিক প্রভাবঃ দুর্নীতি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করে। ব্যাপক দুর্নীতির করণে সরকারের যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও নীতি নির্ধারণে জনগণের স্বার্থ হয় উপেক্ষিত- এ কারণে জনগণ সরকারের প্রতি আস্থা হারায় এবং জাতি ক্রমশ নির্দেশনাহীন ও নিরাপত্তহীনতা বোধ করে।

সামাজিক প্রভাবঃ দুর্নীতির করণেই সমাজের বৈষম্যের মাত্রা বেড়ে যায়। ক্ষমতাবানরা দুর্নীতির মাধ্যমে অনেক সম্পদের মালিক হয় আর জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়ায় দারিদ্ররা আরো দারিদ্র হয়। ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়।

সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাবঃ দুর্নীতির ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উৎকর্ষ লোপ পায়; অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে, সাংস্কৃতিক সংঘাত দেখা দেয় এবং সমাজ জীবনের জটিলতর রূপ ধারণ করে।

মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে প্রভাবঃ দুর্নীতি মানুষকে বৈষয়িক, সম্পদলিপ্সু ও ভোগ বিলাসী করে তোলে। অলসতা ও শ্রমবিমূখতা ডেকে আনে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও নেশাগ্রস্ত করে সর্বোপরি বিবেকের দংশন ও ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ঘটায়।

নৈতিকতার অপমৃত্যুঃ দুর্নীতির প্রসারে নৈতিকতার অপমৃত্য ঘটে ও সমাজ থেকে সৎ ও সুন্দর চেতনা নির্বাসিত হয়।

উপসংহারঃ দুর্নীতি বিস্তারে মানবোন্নয়ন ব্যহত হয়। সাধারণ জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার ইত্যাদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দেশের সাধারণ জনগণ বিশেষ করে নারী, শিশু ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির লোকেরা যারা সুবিধা বঞ্চিত তারাই দুর্নীতির কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে সামাজিক ন্যায় বিচার বাধাগ্রস্ত হয় এবং সুযোগ হ্রাস পাবার কারণে নৈতিক মূল্যবোধ হ্রাস পায়।

৬.৪ দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় সমুহ ঃ

বাংলাদেশে দুর্নীতি অকল্পনীয়ভাবে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্নীতি প্রসরের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এর কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। সমাজের সর্বস্ত্ররের দুর্নীতি যেভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে তা স্বল্পসময়ে ও একটিমাত্র কারণে হয়নি। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বল্প মেয়াদী ও একমুখী সমাধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে দীর্ঘ মেয়াদী ও বহুমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

নিম্নে উল্লেখিত ব্যবস্থগুলো গ্রহণ করে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যেতে পারেঃ

১। রাজনৈতিক সদিচ্ছাঃ দুর্নীতি রোধের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দৃঢ় অঙ্গীকার ও অঙ্গীকার পূরণের সদিচ্ছা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং যদি তারা সদিচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন তাহলে তাদের ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব। এব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন
(ক)দুর্নীতিবাজদের সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন না দেয়া, (খ) অব্যাহতভাবে গণতন্ত্রের চর্চা করা, (গ) প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা,
(ঘ) সংগঠনের মধ্যে জবাবদিহিতা বাস্তাবায়ন, (ঙ) সৎ ও প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া,(চ) অসৎ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ পরিহার করা।

২। কার্যকর সংসদঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রয়োজন কার্যকর সংসদ। সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব, মনোযোগ আকর্ষণ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, শক্তিশালী কমিটির ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হলে বাংলাদেশের দুর্নীতি অনেকাংশেই লাঘব করা সম্ভব।

৩। স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসনঃ বাংলাদেশে বিদ্যমান বিচার বিভাগকে সরকারি প্রভাবমূক্ত করা ও আইনের যথাযথ শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে দুর্নীতি বহুলাংশেই দূর করা সম্ভব।

৪। সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশনঃ দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন। এ কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব।

৫। সুষম বেতন কাঠামো ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণঃ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সুষম বেতন কাঠামো এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৬। দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করাঃ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ কোন না কোন ভাবে দুর্নীতির ফলে ক্ষতির শিকার হয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলো যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর হয় তাহলে দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।
৭। গণমাধ্যমঃ দুর্নীতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজে দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য অনুসন্ধান এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে গণমাধ্যম দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮। ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করণঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করণের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ অনেকাংশে সম্ভব।

৯। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করণঃ দেশ প্রেমে উদ্বদ্ধ করণের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা অনেকাংশে সম্ভব।

<u>উপসংহারঃ</u> বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের কুখ্যাতি অর্জন করেছে। তবুও আমরা মনে করি বাংলাদেশের আকাশ থেকে দুর্নীতির কালো মেঘ একদিন দূরীভুত হবে। কারণ আমরা আশাবাদী। আনিসুল হকের ভাষায়- "আশাবাদী হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি আইফেল টাওয়ার থেকে পড়ে যেতে যেতে মাঝপথে এসে ভাবেন, এখনো তো আহত হইনি।"

৬.৫ দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং যুবসমাজের করণীয় ঃ

সামাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দুর্নীতির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে পারেন।

গণমাধ্যমগুলো দুনীতি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যেমন- টিভি বা রেডিওতে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য একজন ব্যক্তিকে অথবা একটি দলকে উপযুক্ত মর্যাদায় পর্যবসিত করা হয়েছে এমন নাটক বা নাটিকা প্রচার করার মাধ্যমে সামাজিক সচেনতা গড়ে তোলা সম্ভব।

দুর্নীতি প্রতিরোধে যুব সমাজের করণীয় দিকগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন- (১) গ্রামে গ্রামে দুর্নীতি প্রতিরোধ মূলক সংঘ গঠন, (২) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির সুফল কুফল সম্পর্কে ধারণা প্রদান, (৩) হাট বাজার কিংবা সভা সমিতিতে দুর্নীতির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে।

দুর্নীতি একটি সামজিক ব্যাধি। তাই দুর্নীতি প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিরোধ। দুনীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে যুব সমাজকে সক্রিয় ভুমিকা পালন করতে হবে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা ১১ দফা হয়ে ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান সকল পর্যায়েই বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত জাতিকে মুক্তির আলো দেখিয়েছে এদেশের যুব সমাজ। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই দেশ বিশ্বের ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে এক অনুন্য দৃষ্টান্ত। এদেশের যুব সমাজ বার বার প্রমাণ করেছে, আমরা হারিনি, আমরা পেরেছি, আমরা পারব। দেশের প্রতি তরুণদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও দায়িত্ববোধই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে দুর্নীতি বিরোধী এই সামাজিক আন্দোলনকে।

অধ্যায়-৭

দেশপ্রেম।

৭.১ দেশপ্রেমের সংজ্ঞা ও দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা ঃ

মানুষ ভালবাসা ছাড়া বাচতে পারে না। বিধাতা এ হৃদয়টাকে তৈরী করেছেন শুধু মাত্র ভালবাসার জন্য- যে ভালবাসা তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য এবং সমাজের অন্যান্য সকল মানুষের জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ ভালবাসে তার পছন্দের ভালবাসাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভালবাসে শর্তে। কিন্তু মানুষ নিঃস্বার্থভাবে একটি জিনিসকেই ভালবাসে তাহলো তার জন্মভূমিকে। আর এই ভালবাসাকেই বলা হয় দেশপ্রেম।

স্বদেশ মানুষের কাছে পরম সাধনার ধন, নিশ্চিত নিবাস। মা এবং মাতৃভূমি উভই স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। স্বদেশের মানুষ, স্বদেশের রূপ-প্রকৃতি, তার পশুপাখি, গাছপালা নদী-পর্বত এমনকি তার প্রতিটি ধুলিকনাও তার নিকট প্রিয়, পবিত্র। যে দেশ আলো দিল বাতাস দিল, অন্ন-পানি দিল, বস্ত্র দিল, জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্র দিল, সম্মান-মর্যাদা প্রদান করল, তার প্রতি যদি সেই শ্যামল স্নেহে প্রতিপালিত সন্তানদের মমতা মন্ডিত আনুগত্যবোধ না থাকে, তবে তারা কেবল অকৃজ্ঞই নয়, বিশ্বের সকল জঘন্য বিশেষণে বিশেষিত। তারা দেশকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, দেশের দুঃখ-বেদনা অনুভব করেনা। তারা কখনও সত্যিকার অর্থে ধার্মিকও হতে পারে না। দেশপ্রেম সম্পর্কে আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেন- "হুব্বুল ওয়াতন মিনাল ঈনা"- অর্থাৎ স্বদেশ প্রীতি হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ।

স্বদেশ প্রীতি মানুষের একটা শ্রেষ্ঠ গুন। এটি মানব চরিত্রের এক সহজাত প্রবৃত্তি। যেথায় মানুষ জন্মে সেই জন্মভূমিটি তার নিকট জননীর মতই প্রিয়। জননীর রক্ত মাংস যেমন তার সন্তানের দেহের রক্ত মাংস, অস্থিমজ্জার সাথে মিশে যায়, তেমনি জন্মভূমির আলো বাতাস রূপ,রস,গন্ধ দেশবাসীর প্রতিটি অনু পরমানুতে মিশে যায়। জন্মভূমির প্রতিটি ধুলিকনাকে নিজের দেহের প্রতিটি কোষ মনে করে তাকে ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ দেখানোই হচ্ছে স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম।

দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তাঃ- দেশাত্ববোধ পবিত্রতা এবং মহত্বের প্রতীক। এটা এমন একটা গুন যা দেশের স্বার্থে মানুষকে তার সুখ-সমৃদ্ধি, ব্যক্তিস্বার্থ ও নিজের জীবনকেউ উৎসর্গ করতে অনুপ্রানিত করে। দেশপ্রেমই পারে দেশের মঙ্গল ও উন্নতি বয়ে আনতে। একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক স্বদেশের কল্যাণ কামনায় চিরদিনই নিবেদিত প্রাণ। তার নিত্য দিনের চিন্তা ও কর্ম, সাধনা ও কল্পনায়, ধ্যান ও ধারনায় স্বদেশের জন্য নিবেদিত। তিনি বুকভরা ভালভাসা আর সহানুভূতি নিয়ে দেশের দুঃস্থজনের সেবা করেন, অসত্য, হিংসা, দূর্নীতি, সন্ত্রাস ও সকল অন্যাযের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না। দেশের কোথাও বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, ঘুর্নিঝড় অথবা অন্য যে কোনা প্রকার দূর্যোগের কথা শুনলে তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেন না। অন্তরদাহ তাকে সেখানে যেতে বাধ্য করে। একজনধনী দেশ প্রেমিক শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্য স্কুল কলেজ, দুস্থ মানুষের সেবার জন্য হাসপাতাল নির্মান করেন। দেশাত্মবোধ দেশের মানুষের জন্য সহানুভূতি সহযোগিতা এবং ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে।

দেশ প্রেম নিজের দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখায় নিজ দেশের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য ভাবতে এমনকি মরতে শেখায়। এর ফলে শান্তি ও কল্যানের তাৎপর্য একজন দেশ প্রেমিক ব্যক্তি অনুধাবন করে শুধু স্বদেশের কল্যানই নয়, স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব কল্যানের পক্ষে দেশপ্রেমকে ব্যাপ্তকরে দেবার মধ্যেই এর প্রকৃত সাফল্য নিহিত। দেশকে ভালবাসার অর্থ হলো স্বজাতি, স্বসমাজ, মাতৃভাষা, আপন ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইতিহাস, সবদেশের রীতিনীতি, আচার সংস্কার। মানুষ প্রকৃতি সব কিছুকে প্রান দিয়ে ভালবাসা। সবকিছুকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা। জীবনের মঙ্গল ক্ষেত্রে কথায়, কাজে, আচার আচরনে দেশের গৌরব যাতে এতটুকু ক্ষুন্ন না হয়, প্রকৃত দেশ প্রেমিক সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন। নিজেকে আপনদেশ ও জাতির একজন বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।

মূলতঃ দেশ প্রেম এমন একটা আদর্শবাদ যা শক্তি ও সাহসদেয়। দেশপ্রেম আত্মিক সৌন্দর্য বহন করে। দেশের প্রতি মমত্ব বোধ ও শ্রদ্ধাবোধ মানুষকে মহৎ ও স্মরনীয় করে তোলে। মানুষ বেচে থাকে তার কর্মে বয়সে নয়। অনেকে অনেক সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক হতে পারে। কিন্ত তার উক্ত সম্পদ যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যয় না হয় তাহলে তার আত্মা মরা। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ নয় এমন লোক দু'বার করে মরে। তার মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্মরন করে না। তার জন্য একফোটা অশ্রু ও কেউ ফেলেনা। ইংরেজী সাহিত্যের কবিতা Walter Scott তাই যথার্থ বলেছেন-

And doubly dying shall go down
To the vile dust, from Where he sprung.
Unwept, unmoored and unsung.

মানুষের মাঝে বেচে থাকতে চাইলে খাঁটি দেশ প্রেমিক হওয়া উচিৎ। নইলে মরনের পরে তার নাম পৃথিবী থেকে অতিদ্রুত মুছে যাবে। মানুষ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন জীবন গড়ানো উচিৎ যাতে মরনের সময় মানুষ কাঁদে। কবির ভাষায়-

"তুমি এমন জীবন করিবে গঠন
মরনে হাসিবে তুমি
কাঁদিবে ভূবন।

একারনে দেশ প্রেমের প্রয়োজন।

৭.২ দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার উপায় ঃ

পাখি ভালবাসে কষ্টে গড়া তার নীড়কে, অরন্যের ভয়াল জন্ম ও ভালবাসে তার গহিন বনকে, এই অনুভূতিটি তাদের সংসর্গজাত। কিন্ত মানুষের স্বদেশ প্রীতি শুধু সংসর্গজাত নয, জন্ম জন্মান্তরের বংশানুক্রমিক ধারায় একটি বিশিষ্ট রীতিনীতি শিক্ষা সভ্যতার সমন্বয় হতে এটা উদ্ভূত হয়। নিজের দেশের ঐতিহ্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ, প্রীতি ও গৌরবের অনুভূতি হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে থাকে। আত্মার চৈতন্য বোধে স্বদেশ প্রীতি বিরাজমান। এই চৈতন্য বোধ যদি ব্যক্তির ভিতরে বিদ্যামান থাকে তাহলে তাকে নানা ভাবে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন-

১। মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠে ।
২। খাঁটি দেশ প্রেমিকদের জীবন বৃত্তান্ত পড়ে ।
৩। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জেনে।
৪। মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কাহিনী পড়ে ।
৫। বিভিন্ন আন্দোলনে শহীদদের আত্মাহুতির কথা জেনে।
৬। পাঠ্য বইয়ের সকলের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস বাধ্যতা মূলক করে।
৭। মুক্তিযুদ্ধের উপর, ২১ শে ফেব্রুয়ারীর উপর নির্মিত বিভিন্ন চলচিত্র প্রদর্শন করে ।
৮। দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে।
৯। সেমিনারে উদ্দীপনা মূলক বক্তব্যের মাধ্যমে।
১০। জন সভার মাধ্যমে ।
১১। প্রচার মাধ্যমে।
১২। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে ।
১৩। বিশ্ব বরেন্য দেশ প্রেমিকদের ইতহিাস জানার মাধ্যমে।
১৪। সামাজিক ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িয়ে।
১৫। দুস্থ, অসহায় মানুষদের পাশে দাড়ালে।
১৬। আত্ম সম্মান বোধ জাগ্রতের মাধ্যমে।

উপরোল্লেখিত উপায়ে একজন মানুষকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য আত্মসচেতনতাই মানুষকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করাতে পারে।

দেশ প্রেমিকদের উদাহরণ ঃ স্বদেশের জন্য প্রত্যেকের প্রাণ কাঁদে। কেননা দেশের নাড়ির মধ্যে প্রত্যেক মানুষের স্বার্থ জড়িত আছে। এ্ স্বদেশ প্রেমের অনুপ্রেরনায় মানুষ সব যুগেই নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। তারা বুক ভরা ভালবাসা আর সহানুভূতি নিয়ে দেশের দুঃস্থজনের সেবা করেছেন, অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন, আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছেন। কত লোকই প্রচলিত বহ্নিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এই দেশ প্রেম কবির উচ্ছাস নয়, দূর্বল চিত্তের ভাবাবেগ নয়। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, যুগেযুগে মানুষ বিদেশের ঠাকুর ছেড়ে স্বদেশের কুকুরকে পূজা করেছে। দেশ ও জাতির কল্যান কামনায় আত্মোৎসর্গ করেছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য আকাতরে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। নিম্নে বিশ্ববরেন্য কিছু দেশ প্রেমিকদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো ঃ

১। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ঃ তিনি জন্মে ছিলেন মক্কানগরীর কুরাইশ বংশে। সেখানকার আলো, বাতাস জল খেয়ে বড় হয়েছিলেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন মক্কা নগরীতে। বিধর্মী জালেমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর আদেশে যে দিন তিনি জন্ম ভূমি মক্কা নগরী পরিত্যাগ করে রাতের অন্ধকারে গাঁ ঢাকা দিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সেদিন নিজ জন্ম ভূমির কাছে বিদায় নেবার সময় দু'নয়নের অশ্রু ধারায় তার বদন সিক্ত হয়েছিল, জন্ম ভূমির প্রতি অপরিষীম মমতায় চরন যুগল বার বার আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল।

২। টিপু সুলতান ঃ স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই মহীশুরের টিপু সুলতান রনক্ষেত্রে শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। দেশের প্রতি তার ভালবাসা অতুলনীয়।

৩। ক্ষুদিরাম ঃ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আজও শ্রদ্ধার সহিত স্বরণ করে। হাসতে হাসতে এই ছোট শিশুটি ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন শুধু মাত্র দেশকে ভালবেসেছিলেন বলে।

৪। ইলামিত্র ঃ ব্রিটিশ আমলে এ উপমহাদেশের কৃষকরা যখন তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তখন তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অবর্ণনীয় শারিরীক নির্যাতন সহ্য করেছেন এই নেত্রী। কারাগারের ভিতর তার উপর যে শারিরীক নির্যাতন করা হয় তা গা শিহরে উঠার মতো।

৫। সিরাজ উদ্-দৌলা ঃ বাংলার শেষ নবাব সিরাজ উদ্-দৌলা হৃদয়হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। তার শাহাদৎ বরনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।

তেমনি করে স্বদেশ প্রেমের জন্য মৌলানা মুহাম্মদ আলী, সৈয়দ আহমেদ, সূর্যসেন, ঈসা খাঁ, প্রীতিলতা, চাদ সুলতান, রানী লক্ষী বাই প্রমূখ দেশ প্রেমিক বিশ্ব বরেন্য হয়ে আছেন। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে হাজারো শিল্পী করে চিত্রকর দেশ প্রেমের মহিমা ব্যক্তকরে সৃষ্টি করেছেন কত আবেগোদ্দীপক সংগীত, অমর যারা আর অবিনশ্বর চিত্রমালা। এভাবেই ইতহিাসের পাতায় সঞ্চিত হয় দেশ প্রেমের অমর নিদর্শন।

৬। তিতুমীর ঃ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোল করতে গিয়ে তিনিও সাহাদৎ বরন করেন। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের বাহিনীর হাতে শহীদ হলে ইংরেজ সেনাবাহিনীর জেনারেল তার মৃত দেহকে সেল্যুট প্রদান করেছিলেন শুধু মাত্র দেশের প্রতি তার গভীর ভাবাসা থাকার কারনে।

৭। মহাত্মাগান্ধি ঃ ব্রিটিশ তাড়াও আন্দোলনে বিশ্ব বরেন্য এই নেতার নাম। তাকে জাতির পিতার আসনে আসীন করেছেন ভারত বাসীরা।

৮। শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানী ঃ আমার সোনার বাংলা প্রায় দু'শো বছর ব্রিটিশ শাসনামলে ও চব্বিশ বছর বর্বর পাকিস্তানীদের অধিকারে আবদ্ধছিল। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানী ব্রিটিশ উপনিবেসিকদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে স্মরনীয় হয়ে আছেন বাঙ্গালী জাতির মনি কোঠায়।

৮। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্বে সারা বাংলার দামাল ছেলেরা জেগে উঠেছিল। তিনি যখন উচ্চারন করেন এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এই অগ্নি ঝরা ভাষনে বাঙ্গালীরা হাতে অস্ত্র ধারন করে দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ করে সুসজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনীকে পর্যদুস্ত করেছিল এবং পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি দেশের স্থান করে নিয়েছিল। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এদেশ। বাঙ্গালী জাতির দেশপ্রেম বিশ্ববাসীকে